NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিস্যাৎ করতে পারি।

—সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

—Subhas Chandra Bose

Price : ₹ 250.00
[Not for sale]

Printed by Gita Printers, 51A Jhamapukur Lane, Kolkata 700009

1

CBCS • UG • HBG • BENGALI • CC-BG-01

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY | **SELF LEARNING MATERIAL**

UNDER GRADUATE DEGREE PROGRAMME

HBG

CC-BG-01

HONOURS IN BENGALI

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
(প্রাচীন ও মধ্যযুগ)

CHOICE BASED CREDIT SYSTEM

উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত নির্দেশনামায় স্নাতক শিক্ষাক্রমকে পাঁচটি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল—'কোর কোর্স', 'ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ', 'জেনেরিক ইলেকটিভ' এবং 'স্কিল'/ 'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেডভিত্তিক যা অবিচ্ছিন্ন আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে এগোবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই নতুন শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য।

UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 অনুযায়ী সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক পাঠক্রমে এই সি.বি.সি.এস. পাঠক্রম পদ্ধতি কার্যকরী করা বাধ্যতামূলক—উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশনাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণমূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠউপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন—যদিও পূর্বের মতই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। এই নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি-প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্তশিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং এই উদ্যোগের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক বাংলা পাঠক্রম (HBG)

কোর কোর্স ঃ CC-BG-01

মডিউল ঃ ১,২,৩,৪ Module : 1,2,3,4

(স্নাতক পাঠক্রম)

প্রথম মুদ্রণ ঃ জুলাই, 2021

বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত
Printed in accordance with the regulations of the
Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক বাংলা পাঠক্রম (HBG)

কোর কোর্স ঃ CC-BG-01

মডিউল ঃ ১,২,৩,৪ Module : 1,2,3,4

(স্নাতক পাঠক্রম)

কোর কোর্স ঃ ২/ Core Course : 2	লেখক Course writer	সম্পাদক Course Editor
মডিউল ঃ ১ Module: 1	ড প্রতুলকুমার পণ্ডিত	ড প্রতুলকুমার পণ্ডিত
মডিউল ঃ ২ Module: 2	ড উত্তমকুমার পণ্ডিত সহকারী অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়	
মডিউল ঃ ৩ Module: 3	অধ্যাপক বাণীমঞ্জরী দাস	
মডিউল ঃ ৪ Module: 4	ড শক্তিনাথ ঝা	

ঃ স্নাতক-বাংলা বিষয় সমিতি ঃ

ড শক্তিনাথ ঝা, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ কলেজ, মুর্শিদাবাদ
বাণীমঞ্জরী দাস, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা, বেথুন কলেজ, কলিকাতা
ড নীহারকান্তি মণ্ডল, সহযোগী অধ্যাপক, মুরলীধর গালর্স কলেজ, কলিকাতা
ড চিত্রিতা ব্যানার্জি, সহযোগী অধ্যাপক, শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ, কলিকাতা
আব্দুল কাফি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
ড অনামিকা দাস, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
ড. প্রতুলকুমার পণ্ডিত, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ ও
অধিকর্তা, মানববিদ্যা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষণা

এই পাঠ উপকরণের সমুদায় স্বত্ত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যাতিরেকে এই পাঠ উপকরণের কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা পুনরুৎপাদন এবং কোনোরকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ বে-আইনি ও নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় বিধিসম্মত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

কিশোর সেনগুপ্ত
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক বাংলা পাঠক্রম

কোর কোর্স : **CC-BG-01**

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)

মডিউল : ১ সাহিত্যের ইতিহাসের যুগ বিভাগ ও প্রাচীন যুগ

একক : 1 বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ **9-11**

একক : 2 আদিপর্বের গতিপ্রকৃতি ও নির্দশন সমূহ **12-16**

একক : 3 চর্যাপদ **17-21**

মডিউল : ২ আদি-মধ্যযুগ

একক : 4 শ্রীকৃষ্ণকীর্তন **23-31**

একক : 5 অনুবাদ সাহিত্য : ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত **32-35**

একক : 6 মহাভারত ও ভাগবত **35-39**

একক : 7 বৈষ্ণব পদাবলী : বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস **40-48**

একক : 8 জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস **44-48**

মডিউল : ৩ অন্ত্য-মধ্যযুগ-১

একক : 9 চৈতন্য-চরিতসাহিত্য : চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত 53-56

একক : 10 ‘চৈতন্যভাগবত’ ও ‘চৈতন্যমঙ্গল’ 56-59

একক : 11 ‘চৈতন্য চরিতামৃত’ 59-62

একক : 12 মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ও বিকাশ 63-66

একক : 13 মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল 67-72

একক : 14 ধর্মমঙ্গল কাব্য 72-77

একক : 15 চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল 78-83

একক : 16 অন্নাদামঙ্গল 83-88

মডিউল : ৪ অন্ত্য-মধ্যযুগ-২

একক : 17 প্রণয়োপাখ্যান : শাহ মুহম্মদ সগীর, দৌলত কাজী, আলাওল 91-95

একক : 18 সৈয়দ আলাওল ও পদ্মাবতী 96-97

একক : 19 শাক্ত পদাবলী : রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য 98-101

একক : 20 কমলাকান্ত ভট্টাচার্য 101-102

একক : 21-22 বাউলগান, লালন সাঁই, হাসন রাজা, দুদ্দু সা 103-108

একক : 22 দুদ্দু সা ও হাসন রাজা 108-114

মডিউল : ১

সাহিত্যের ইতিহাসের যুগ বিভাগ ও প্রাচীন যুগ

একক ১ ❐ বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য
১.২ প্রস্তাবনা
১.৩ যুগবিভাগ
১.৪ সংক্ষিপ্তসার

১.১ উদ্দেশ্য

বাংলা সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনায় এই সাহিত্যের ইতিহাস বা ধারার বিবর্তন সম্পর্কে সম্যক ধারনা দেওয়াই এই পর্যায়ের [মডিউল] উদ্দেশ্য। বাংলা সাহিত্যের ব্যাপ্তি সহস্রাধিক বছর। এই দীর্ঘকালের ইতিহাসে এর নানা বৈশিষ্ট্য, বিবর্তন, পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সেই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে দীর্ঘকালের ইতিহাসকে লক্ষণ অনুযায়ী বিভিন্ন যুগে ভাগ করা হয়ে থাকে আলোচনার সুবিধার্থে। এই পর্যায়ে তার একটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীদের মনের মধ্যে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে একটা ছবি স্পষ্ট হবে।

১.২ প্রস্তাবনা

এই পর্যায়ে বাংলা সাহিত্যের দীর্ঘকালের ইতিহাসের পর্ব বা যুগবিভাগ নিয়ে আলোচনা করা হবে। ভাষাগত সমাজগত ও রাজনীতিক পটভূমিকায় বিভিন্ন লক্ষণানুসারে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ধারা প্রধানত আদি, মধ্য ও আধুনিক এই তিন পর্বে ভাগ করা হয়েছে। তিনটি যুগের ভাষাবৈশিষ্ট্য, সামাজিক ও রাজনীতিক পটভূমির পরিচয় দিয়ে যুগবৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ আলোচতি হবে। তার ফলে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবেন, বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ থেকে বর্তমান কালপর্বে পৌঁছনোর ইতিহাস।

১.৩ বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

সহস্রাধিক বছরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে জানা এবং তার ধারাবাহিক বিবর্তনের আলোচনা করার সুবিধার্থে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করে নেওয়া হয় যা সাধারণত অন্যান্য বিষয়ের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও করা হয়। ভাষাগত বিশেষত্ব, সামাজিক অবস্থা, রাজনীতিক পরিস্থিতি ও ধর্মীয় বাতাবরণ প্রভৃতির বিচারে বাংলা সাহিত্যের সমগ্র কালকে আদি, মধ্য ও আধুনিক এই তিনটি পর্ব বা যুগে ভাগ করা হয়েছে।

বাংলা ভাষায় রচিত অদ্যাবধি প্রাপ্ত গ্রন্থ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের লেখা পদসংকলন ‘চর্যাগীতিকোষ’, সংক্ষেপে ‘চর্যাপদ’ যা খ্রিস্টিয় দশম-দ্বাদশ শতকে রচিত বলে ভাষাবিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, সেটিই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন অর্থাৎ একমাত্র এই গ্রন্থটি। এছাড়া ঐ যুগে রচিত অন্য কোনো গ্রন্থ এতাবৎ পাওয়া যায়নি। তাই এই গ্রন্থটিই বাংলা সাহিত্যের আদিযুগের একমাত্র রচনা। কারণ এরপর ভাষাগত বিচারে যে গ্রন্থটির

নাম করা যায় তা হল বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এটি রাধাকৃষ্ণের কাহিনি অবলম্বনে রচিত কাব্য। এটি খ্রিস্টিয় ১৩শ-১৪শ শতকে রচিত বলে ভাষাতাত্ত্বিকগণ মনে করেন। এই গ্রন্থটিকে দ্বিতীয় পর্বের অর্থাৎ মধ্যযুগের প্রথমদিকে রচিত প্রথম গ্রন্থ বলা হয়ে থাকে। সেই দ্বাদশ/ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কালকে মধ্যযুগ ধরা হয়। তারপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের সূচনার পর, উনিশ শতক থেকে আধুনিক যুগের সূত্রপাত। মধ্যযুগের ব্যাপ্তি প্রায় ৫০০ বছর। তাই এই যুগকে দুভাগে ভাগ করা হয়—আদি মধ্যযুগ ও অন্ত্যমধ্যযুগ। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকে মাঝখানে রেখে দুটি ভাগও অনেকে করেন—প্রাক্-চৈতন্যযুগ ও উত্তর-চৈতন্য যুগ। অর্থাৎ চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে রচিত কাব্যাদিকে 'প্রাক্-চৈতন্যযুগে'র ও চৈতন্যের আবির্ভাবের পর অর্থাৎ চৈতন্যের প্রভাবে বঙ্গদেশে যে ধর্মীয় বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল তার প্রভাবে রচিত সাহিত্যিকে 'উত্তর-চৈতন্য' যুগের বলা হয়। পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত যুগকে আদি মধ্যযুগ বা প্রাক্‌চৈতন্য ও তারপর থেকে ঊনবিংশ শতকের আগে পর্যন্ত যুগকে অন্ত্যমধ্যযুগ বা উত্তর চৈতন্য যুগ বলা হয়ে থাকে। সূক্ষ্ম বিচারে অনেকে আবার চৈতন্যের সমকালে কাব্যাদিকে 'চৈতন্যযুগ' বলার পক্ষপাতী। অর্থাৎ কাব্যযুগকে তিনটি উপপর্বে ভাগ করতে চেয়েছেন অনেকে।

আদি-মধ্যযুগে রচিত কাব্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন', শাহ্ মহঃ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা', অনুবাদ সাহিত্য, বিদ্যাপতির রচনা, দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদাবলী, জ্ঞানদানের পদাবলী প্রভৃতি। এবং অন্ত্য-মধ্যযুগের নিদর্শন গোবিন্দদাস প্রমুখ কবির বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য (চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি), শাক্ত পদাবলী, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি। ভারচন্দ্রই মধ্যযুগের শেষ কবি। তারপরই পাশ্চাত্য প্রভাবিত সাহিত্যের যুগ, যাকে আধুনিক যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন শুরু হওয়ার পর বাংলার সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, শিল্পচর্চা, বিদ্যাচর্চায় পাশ্চাত্য প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়তে থাকে। বাঙালি জীবনের সেই প্রভাব সাহিত্যেও পড়ে। নতুন শাসক, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, খ্রিস্টান মিশনারীদের উদ্যোগে বাংলা গদ্যের চর্চা শুরু হয়। তার আগে বাংলা সাহিত্যে পদ্যের প্রাধান্য, সব পদ্যে লেখা হতো। ইংরেজদের এবং রাজা রামমোহন রারে উদ্যোগে বাংলা গদ্যে লেখালেখি শুরু হয়। এই সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্য বাংলার বিদগ্ধ সমাজে পঠিত ও আলোচিত হবার সুবাদে বাংলা সাহিত্যে তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়তে থাকে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। সেই সময় থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূচনা। অদ্যাবধি সেই আধুনিক যুগ চলছে।

১.৪ সংক্ষিপ্তসার

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

প্রাচীন যুগ	মধ্যযুগ	আধুনিক যুগ
[খ্রি. ১০ম-১২শ শতক]	[খ্রি. ১২শ/১৩শ শতক থেকে ১৮শ শতক]	[খ্রি. ১৯শ শতক থেকে বর্তমান কাল]

তিন যুগের সাহিত্যিক নিদর্শন

প্রাচীন যুগ : চর্যাগীতি কোষ [আনুমানিক ১০ম-১২শ শতক]

মধ্যযুগ [আদি-মধ্য]: শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, বিদ্যাপতি-দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদাবলী, শাহ্ মহঃ সগীরের 'ইউসুফ

জোলেখা প্রভৃতি।

[অন্ত-মধ্য]: মঙ্গলকাব্য (চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি) বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, দৌলতকাজী, আলাওলের কাব্য প্রভৃতি।

আধুনিক যুগ: অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন শুরু হওয়ার পর সমাজ ধর্ম রাজনীতি, শিল্পচর্চা, বিদ্যাচর্চায় পাশ্চাত্য প্রভাব ব্যাপকভাবে বাঙালি জীবনে পড়ে। তারই প্রতিফলন পড়ে বাংলা সাহিত্যে। বাংলা গদ্যচর্চা ইংরেজ শাসনের অন্যতম ফল। কারণ উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত অর্থাৎ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য পদ্যে রচিত। গদ্যে সাহিত্য রচনার নমুনা নেই। দু-একটি চিঠিপত্রে, বা প্রাচীন অর্বাচীন কোনো কোনো পুঁথিতে গদ্যের নিদর্শন দু'একটি পাওয়া যায় মাত্র, তা নিতান্তই নগণ্য। খ্রিস্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে গদ্য রচনার উদ্যোগ এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিভিলিয়নদের এদেশীয় ভাষা শেখানোর উদ্দেশ্যে বাংলা গদ্যচর্চার সূত্রপাত ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮০০ সাল)। মূলত এখান থেকেই বাংলা গদ্যরচনার প্রচেষ্টা ও পাশ্চাত্য প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সূচনা। [প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৮শ শতকের দুটি গ্রন্থের কথা : মান-এল দ্য আসাম্প সাঁউ—'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ও দোম আন্তনিও-র 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ। গ্রন্থ দুটি রোমান হরফে লিসবন শহর থেকে মুদ্রিত। এখানে বাংলা গদ্যের দেখা পাওয়া যায়।] এই সময় থেকেই গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ সাহিত্য ও সাময়িক পত্রের প্রকাশ লক্ষণীয় হয়ে উঠল। রাজা রামমোহন রায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখের লেখনীতে তার বিকাশ। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের ইতিহাসের আলোচনায় তা বিস্তারিতভাবে জানা যাবে।

একক ২ ☐ আদিপর্বের গতিপ্রকৃতি ও নিদর্শন সমূহ

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য
২.২ বাংলা ও বাঙালির পরিচয়
২.৩ বাংলার সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি ও নিদর্শন
২.৪ সংক্ষিপ্তসার

২.১ উদ্দেশ্য

সাহিত্য দেশকাল ও মানুষের জীবন-নির্ভর। মানুষের জীবনই সাহিত্যের উপজীব্য আর জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় যুগ বা কালের দ্বারা। লেখকের কাল লেখকের গোচরে অগোচরে কাজ করে যায় লেখকের উপর। তাই সাহিত্যের আলোচনায় সেই যুগের সমাজ, জীবন প্রভৃতির পরিচয় সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যের সম্যক পরিচয়ের জন্য বাংলা বা বঙ্গদেশ সম্পর্কেও ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। বাংলার ভূগোল, সমাজ, রাজনীতি ও ধর্মীয় ইতিহাসের পরিচয় জানতে হবে সহস্রাধিক বছরের বাংলা সাহিত্যকে উপলব্ধির জন্য। সাহিত্য আলোচনার পূর্বে তার পটভূমি, দেশের পরিচয় গ্রহণ প্রয়োজন।

২.২ বাংলা ও বাঙালির পরিচয়

বঙ্গদেশে বসবাসকারী বঙ্গভাষী মানুষই বাঙালি হিসাবে পরিচিত। তাই প্রথমে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বঙ্গদেশের চৌহদ্দিটা জানা প্রয়োজন। প্রাচীনকালে উত্তর ভারত বা আর্যাবর্তের লোকজন ভারতের পূর্বপ্রান্তের মানুষজন সম্পর্কে উচ্চধারণা পোষণ করত না, হীন ধারণাই ছিল,—তাদের কাছে এদেশ ছিল—"দেশো'নার্যনিবাস"—এটি অনার্যদের দেশ। তাই তাদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা থাকা সম্ভব নয়। আর্যাবর্তের কোনো মানুষ এদেশে এলে বা এদেশের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে তাকে ব্রাত্য বা সমাজচ্যুত করা হতো। পরে ক্রমশ সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে, উন্নাসিকতা কমতে থাকে। আর্যসংস্কার, সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্র সংহিতার প্রভাব পড়তে থাকে এবং আর্যভাষা ও সংস্কৃতির প্রাধান্য লক্ষণীয় হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশ বা বঙ্গভূমির ভৌগোলিক সীমানার বারবার পরিবর্তন ঘটেছে, নামেরও নানা রূপ দেখা যায়। বঙ্গ, গৌড়, রাঢ়, সমতট পরবর্তীকালে একত্র হয়ে বঙ্গদেশ বা বাংলাদেশ নামে অভিহিত হয়েছে। যদিও বর্তমানে সেই বৃহত্তর বঙ্গদেশের পূর্বাংশ আলাদা রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এখানে আমাদের প্রাচীনবঙ্গের সীমানা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার চেষ্টা করা যাক। এই ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারণের কাজটি সহজ নয়। আমরা এ বিষয়ে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের সাহায্য নিতে পারি। তিনি লিখেছেন—'উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয়ধৃত নেপাল, সিকিম ও ভোটান রাজ্য; উত্তর পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র নদ ও উপত্যকা, উত্তর পশ্চিম দিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি; পূর্বদিকে গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বাহিয়া দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত; পশ্চিমে রাজমহল-সাঁওতাল পরগনা-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূম-কেওঞ্জর-ময়ূরভঞ্জের শৈলময়, অরণ্যময় মালভূমি; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই প্রাকৃতিক সীমাবিধৃত

ভূমিখণ্ডের মধ্যেই প্রাচীন বাংলার গৌড়-পুণ্ড্র-বরেন্দ্র-রাঢ়-সূক্ষ্ম-তাম্রলিপ্তি-সমতট-বঙ্গ-বঙ্গাল-হরিকেল প্রভৃতি জনপদ; ভাগীরথী-করতোয়া-ব্রহ্মপুত্র-পদ্মা-মেঘনা এবং আরো অসংখ্য নদনদী বিধৌত বাংলার গ্রাম প্রান্তর, পাহাড়, কান্তার। এই ভূখণ্ডই ঐতিহাসিক কালের বাঙালির কর্মকৃতির উৎস এবং ধর্ম-কর্ম-নর্মভূমি।' [দ্র. বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং। ১৪০০ বঙ্গাব্দ। পৃ. ১২৫] এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সীমানায় ও নামে পরিচিত হলেও শেষে 'গৌড়' নামেই সমগ্র দেশের কাছে পরিচিত হয়েছিল। তারপর ইসলামি শাসনকালে 'বঙ্গ' নামটির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। ইংরেজ আমলে 'বঙ্গ' বেঙ্গাল, বাংলা নামে পরিচিতি লাভ করে। অবশ্য এই সীমা রাজনীতিক। আর 'বঙ্গ' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রি.পূ. ২য় শতকে পতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে'। কালিদাসের 'রঘুবংশে' রঘুর দিগ্‌বিজয়ে বঙ্গের উল্লেখ আছে। [বঙ্গ শব্দের সঙ্গে 'আল' প্রত্যয় যোগ করে 'বঙ্গাল' হয়।] তবে পর্তুগীজরা Bengala শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছে, এ প্রসঙ্গ পূর্বে উত্থাপিত হয়েছে। অবশ্য 'বঙ্গাল' শব্দটি ১১শ শতাব্দীতে পাওয়া যায়, ১২শ শতকের একটি অনুশাসনেও শব্দটি পাওয়া যায়।

খ্রি. পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত শাসনকালে এই বঙ্গদেশের উত্তর ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। সেখানকার শিল্পসাহিত্য সংস্কৃতির অংশীদার হয়ে ওঠে। ভাষার দিক থেকেও ভারতীয় আর্যভাষার প্রাধান্য দেখা যায়। এই সময় বেদ-উপনিষদ সংহিতার প্রভাব পড়তে শুরু করে। গুপ্ত যুগের পর রাজা শশাঙ্কের শাসনকালে বাংলার ভিত্তি অনেকটাই দৃঢ় হয়। তাঁর পর প্রায় এক শতক অরাজক অবস্থায় নানান বিশৃঙ্খলায় কাটে। তখন রাজপুরুষেরা মিলিতভাবে গোপালদেব নামক এক সেনানায়ককে রাজা রূপে বরণ করে এই বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা থেকে উদ্ধার পেতে। খ্রি. অষ্টম শতকে গোপালদেব সিংহাসনে আরোহণ করার পর দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত তাঁর উত্তরসূরিরা বাংলা শাসন করে গেছেন। তারপর পারিবারিক কলহ প্রভৃতিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এই পালবংশ এবং ক্ষমতা হারায়। তখন সামন্তরাজাদের উত্থান হয়। এই সময়েই ভিন্নপ্রদেশ কর্ণাটদেশ থেকে আগত সেনবংশীয় ব্রাহ্মণ রাজারা সামন্তদের সঙ্গে যোগ দিয়ে দুর্বল পালরাজাদের সিংহাসন চ্যুত করে সিংহাসনে বসেন। জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেও তাদের বৃত্তি ছিল ক্ষত্রিয়ের, তাই তাঁরা 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' নামে পরিচিত ছিলেন। যাই হোক সাময়িক বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তি দিয়ে এই সেনবংশ রাজত্ব শুরু করে। সেন বংশের আদি পুরুষ সামন্ত সেন আগেই গৌড়ের ভাগীরথী তীরে বসবাস শুরু করেছিলেন, তাঁর পৌত্র বিজয় সেন ক্ষমতা দখল করে আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁর পুত্র বল্লাল সেন ১১৫৮ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন ১১৭৮ সালে রাজা হয়ে বাংলায় সেন বংশকে দৃঢ় করেন। ১২০২ সালে ইফ্‌তিকার-উদ্দিন- বিন-বখতিয়ার খলজি বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন ও রাজা লক্ষ্মণ সেন সিংহাসন চ্যুত হন। এরপর থেকে বাংলায় ইসলামি শাসন যুগ ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত।

পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁরা বৌদ্ধ হলেও এখানকার স্থানীয় অধিবাসী ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করে চলতেন। অন্য ধর্মের প্রজাদের মর্যাদা দিতেন। ফলে বৌদ্ধদের সঙ্গে হিন্দুদের রেষারেষির সম্পর্ক অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছিল। সেন রাজাদের আমলে ধর্ম ও সংস্কৃতিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব পড়েছিল। বল্লাল সেন কনৌজ থেকে পাঁচ কুলীন ব্রাহ্মণ এনে বাংলার হিন্দু তথা ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন। যাইহোক, এই পর্যায়ে আমাদের বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও আদিপর্বের আলোচনার প্রারম্ভে এই সময়ের রাজনৈতিক পরিচয়টুকু জানার জন্য এই আলোচনা, ইতিহাস চর্চা নয়।

বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বের আলোচনায়, এই পর্বের বাংলা ভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতির তৎকালীন চিত্রটি লেখা প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বের আলোচনায় এই পর্বের প্রধান নিদর্শন ও একমাত্র নিদর্শন 'চর্যাগীতি

কোষ' গ্রন্থটির কথা উল্লেখিত হয়েছে। যার রচনাকাল আনুমানিক দশম শতাব্দী। এই সময় বাংলায় লেখা অন্য কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে তাহলে কি বাঙালিরা সাহিত্য-বিমুখ ছিল? না, বাঙালি সাহিত্য বিমুখ নয়। চর্যাপদের সমসময়ে বাঙালির লেখা অন্যান্য অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায়, তবে সেগুলি বাংলা ভাষায় নয়। কারণ বাঙালির বাংলা ভাষাচর্চা তখনও এতখানি প্রাধান্য পায়নি। তখন রাজকার্য মূলত চলত সংস্কৃত ভাষায় এবং বাংলা ছাড়া সংস্কৃত প্রাকৃত, অপভ্রংশে লেখার চল ছিল। বাংলা তখন সদ্য মাগধী অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে নতুন ভাষা হিসাবে চিহ্নিত হতে শুরু করেছে। তাই বাংলা লেখার গুরুত্ব ততখানি ছিল না। মূলত রাজভাষার গুরুত্ব ও তার প্রতি আনুগত্যই সবসময় লক্ষণীয়। আর বাংলার তো কথাই নেই। সেন রাজারা সংস্কৃতপন্থী, তাঁদের রাজসভায় সংস্কৃতের চর্চা হতো। কবি জয়দেব ও অন্যান্য সভাসদগণ সংস্কৃতের পোষক ছিলেন। জয়দেবের 'গীত গোবিন্দম্' সমগ্র ভারতে জনপ্রিয়তার চরম শিখরে উঠেছিল।

২.৩ বাংলা ও বাঙালির সাহিত্যিক গতিপ্রকৃতি ও নিদর্শন সমূহ

বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার বা সাহিত্য চর্চার তেমন কোনো লক্ষণ বাংলায় পাল রাজত্বের পূর্বে প্রায় ছিল না বললেই চলে। চর্যাপদ বা চর্যাগীতিকোষ একমাত্র নিদর্শন বলে এ-পর্যন্ত প্রমাণিত। তাই বলে বাঙালিরা সাহিত্যচর্চা থেকে বিরত ছিল একথা বলা যায় না। গুপ্তযুগ বা তা আগেই বাংলার বিদ্যাচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত, প্রাকৃত অপভ্রংশে বিভিন্ন ধরনের রচনায় বাঙালির সাহিত্যচর্চার পরিচয় লক্ষণীয়। এই গৌড়বঙ্গে সংস্কৃত চর্চা চলত তার প্রমাণ, সংস্কৃতে সারা দেশে যে চারটি রীতিতে সাহিত্য রচনা হত তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গৌড়ীরীতি। গৌড়ী অর্থাৎ গৌড়দেশীয়। আড়ম্বরপূর্ণ ও গুরুগম্ভীর শব্দপ্রয়োগ এই রীতির বিশেষত্ব। কাব্য-সাহিত্য ছাড়াও বিভিন্ন শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতিতে গৌড়ী রীতির সংস্কৃতের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ সাহিত্য অপেক্ষা দর্শন, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রের দিকেই তাঁদের ঝোঁক ছিল তা তাঁদের রচনা থেকেই জানা যায়। এখানে উল্লেখ্য—সর্বানন্দের 'টীকা সর্বস্ব', ভবদেবের 'স্মৃতি মীমাংসা', প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ, জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ', হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' প্রভৃতি। আবার অভিনন্দ ও সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' [দুজনের কাব্যের নাম একই]।

এছাড়াও সেন রাজাদের সভাকবিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, যাঁরা হলেন—জয়দেব, ধোয়ী, শরণ, উমাপতি, গোবর্ধন। প্রধান কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দমে'র কথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কাব্যটি সারা ভারতে জনপ্রিয় কাব্য। তাছাড়া রাজসভার অন্যান্য কবিগণও তাঁদের দান রেখে গেছেন। উল্লেখ্য—ধোয়ীর 'পবনদূত' (কালিদাসের মেঘদূতের আদর্শ রচিত), গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যা সপ্তশতী'। প্রসঙ্গত কয়েকটি সংকলন গ্রন্থের নাম করতে হয় যেগুলি বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছে—'সুভাষিত রত্নকোশ' (কবীন্দ্র বচন সমুচ্চয়), 'সদুক্তি কর্ণামৃত' ও 'প্রাকৃতপৈঙ্গল'।

সুভাষিত রত্নকোশ (কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়): বঙ্গদেশে ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে সংকলিত, সংস্কৃতে লেখা প্রকীর্ণ শ্লোক বা ছোট কবিতার সংকলন। খণ্ডিত পুঁথিটিতে নামপত্র পাওয়া যায়নি। F. W. Thomas গ্রন্থটিকে 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়' নাম দিয়ে ১৯১২ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশ করেন। পরে একটি সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায়, সেখানে সংকলনটির নাম পাওয়া যায়—'সুভাষিত রত্নকোশ'। লিপি দেখে মনে হয় ১২০০ সালের আগে লেখা তাই রচনাগুলি তার আগেই লেখা। দ্বিতীয় পুঁথিটিতে সংকলয়িতার নাম পাওয়া যায়—বিদ্যাকর। তিনি সৌগত (অর্থাৎ বুদ্ধের উপাসক)। কারণ বুদ্ধবন্দনা দিয়ে গ্রন্থের আরম্ভ। এখানে অনেক বাঙালি কবির নাম পাওয়া যায়—মধু শীল, রতি পাল, বীর্য মিত্র, বিনয় দেব প্রভৃতি।

সদুক্তি কর্ণামৃত: এই সংকলনটির সংকলনের সমাপ্তি ১২০৭ সালের প্রথম দিকে। সংকলক শ্রীধর দাস। তাঁর পিতা বটু দাস ছিলেন রাজা লক্ষ্মণ সেনের বন্ধু ও প্রতিরাজ (রাজ প্রতিনিধি)। সংকলনটিকে রাজা, অমাত্য থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের রচনাও স্থান পেয়েছে—লক্ষ্মণ সেন, কেশব সেন, রাজপুত্র দিবাকর, ধোয়ী, উমাপতি ধর, গোবর্ধন আচার্য প্রভৃতির সঙ্গে যে নামগুলি বাঙালির পরিচয় বহন করে তাঁরা হলেন—কমল গুপ্ত, রবি গুপ্ত, কালিদাস নন্দী, যজ্ঞ ঘোষ, দিবাকর দত্ত, প্রভাকর দত্ত প্রভৃতি।

প্রাকৃত পৈঙ্গল: বঙ্গদেশে রচিত বা সংকলিত গ্রন্থগুলির মধ্যে আর একটির নাম 'প্রাকৃতপৈঙ্গল'। প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠে কিছু কিছু লেখা হয়েছিল বাংলাদেশে। তেমনি কিছু প্রকীর্ণ রচনা পাওয়া যায়। 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' নামক প্রাকৃত ভাষায় লেখা প্রাকৃত ছন্দ শেখানোর জন্য রচিত গ্রন্থটিতে। সেগুলি অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ ব্যবহৃত প্রকীর্ণ কবিতাগুলি অপভ্রংশ, অবহট্‌ঠে লেখা হলেও সেখানে মৈথিলী ও বাংলার লক্ষণ পাওয়া যায়। গ্রন্থটি চতুর্দশ শতাব্দীর, কিন্তু রচনাগুলি তার পূর্বের বলে অনুমান করা হয়।

বর্তমান আলোচনায় বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বে সমকালীন বাংলা দেশের সাহিত্যচর্চা ও সমাজ, ধর্ম সম্পর্কে ধারণা করার চেষ্টা করা গেল। দেখা যাচ্ছে, বাংলা ভাষার উন্মেষকালে বাঙালির বাংলায় লেখার প্রবণতা ছিল না। তখন রাজভাষা মূলত সংস্কৃত এবং শিল্পসাহিত্য চর্চাও চলত সংস্কৃত ভাষায়। গুপ্তযুগের পূর্বে বাঙালিরা খুব একটা মর্যাদা পেত না। মৌর্য ও গুপ্ত যুগে উত্তর ভারতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়, বাঙালি মর্যাদা লাভ করে। হিন্দু বৌদ্ধ ও স্থানীয়দের মধ্যে সদ্‌ভাব ছিল না; কিন্তু পরে বিরূপতার লাঘব ঘটে। আর বঙ্গদেশের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক সীমানার বিভিন্ন পরিবর্তন-শেষে আমরা বর্তমানে বঙ্গদেশ বলতে বুঝি, উত্তরে নেপাল ও হিমালয় পর্বত, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, গারো জৈন্তিয়া, ত্রিপুরা, পশ্চিমে ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, দক্ষিণে বঙ্গোপাসাগর ঘেরা ভারতভূমির অংশই বঙ্গদেশ। তবে বর্তমানে এই বঙ্গদেশের পূর্বাংশ আলাদা রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হয়েছে 'বাংলাদেশ' নামে। তাই আলোচনায় অনেক সময় বিভ্রান্তি ঘটা অস্বাভাবিক নয়।

খ্রিস্টিয় নবম-দশক শতকের আগে বঙ্গভাষায় কোনো রচনা পাওয়া যায় না। সেই সময়ে একমাত্র 'চর্যাপদ' ছাড়া অন্য কোনো রচনা পাওয়া যায়নি। অবশ্য ঐ সময় বাঙালির পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সমকালীন প্রবণতা বাঙালির বাংলা ভাষায় রচনার অনুকূল ছিল না। তবে বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার অভাব ঘটেনি। সাহিত্য-ধর্ম-দর্শন ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে বাঙালির দান কম নয়।

২.৪ সংক্ষিপ্তসার

সাহিত্যে সমকালীন দেশকালের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। সমকালীন সমাজ দেশকাল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে লেখককে প্রভাবিত করে অর্থাৎ লেখকের কাল লেখকের মনের গোচরে অগোচরে কাজ করে চলে। তাই বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বের আলোচনায় বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থটির রচনাকালীন পরিবেশ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

যে বাংলা ও বাঙালি নিয়ে চর্চা তা প্রাচীনকালে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল বিভিন্ন সময়ে, তার সীমানারও পার্থক্য ঘটে। 'বঙ্গ' শব্দটিকে আমরা দেখি খ্রি.পূ. দ্বিতীয় শতকে পতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে'। কালিদাসের 'রঘুবংশে' ও রঘুর দিগ্‌বিজয়ে বঙ্গের উল্লেখ আছে। কিন্তু বঙ্গ বা বাঙালিদের প্রতি আর্যাবর্তের মানুষের কোনো ভালো ধারণা ছিল না। তবে মৌর্য ও গুপ্তযুগে এই ধারনার পরিবর্তন ঘটে, সম্পর্কের উন্নতি হয়। বাঙালির শিল্প সাহিত্যের প্রতি আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। গুপ্ত শাসনকালের পর রাজা শশাঙ্কের রাজত্বকালে বাংলার ভিত্তি আরো দৃঢ় হয়। রাজা শশাঙ্কের পর প্রায় একশো বছর দেশে অরাজকতার সূত্রে মাৎস্যন্যায় চলে। সেই

বিশৃঙ্খলায় বাঙালি জীবন স্তব্ধ হয়ে যায়। তখন রাজপুরুষেরা মিলে গোপালদেব নামক এক সেনানায়ককে গৌড় বা বাংলার সিংহাসনে বসান। তিনি ও তাঁর উত্তরসূরিগণ তিনশো বছর বাংলায় রাজত্ব করেন। তাঁরা মূলত বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁরা বৌদ্ধ হলেও হিন্দু বা অনার্যদের উপেক্ষা করতেন না, বরং পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়, এই পাল রাজাদের আমলে। এরপর সেন বংশ বাংলার সিংহাসনে বসেন। তাঁরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বল্লাল সেন ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি সংহিতা, কৌলীন্য প্রথার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এরা রাজত্ব করেন। তারপর দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে ইসলামি আক্রমণে সব বিপর্যস্ত হয়ে যায়। ১২০২ সালে তুর্কি ইখ্‌তিকার উদ্দিন-বিন-বখ্‌তিয়ার খিলজি লক্ষ্মণ সেনকে সিংহাসনচ্যুত করেন, তারপর চলে ইসলামি শাসন।

আমাদের আলোচ্য পর্বে সমকালীন শিল্প সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত হচ্ছিল। এই সময় বাংলায় সাহিত্য রচনার পরিবেশ অনুকূল ছিল না। আর বাংলাভাষা সবেমাত্র অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসছে, সেই সময় সাহিত্য রচনার পরিস্থিতি ছিল না। আবার সে যুগে সংস্কৃতে লেখার চল ছিল। এই সময়, পাল রাজাদের শাসনপর্বে রচিত 'চর্যাপদে'র নিদর্শনই একমাত্র পাওয়া যায়। তবে বাঙালি শিল্প সাহিত্য চর্চায় সক্রিয় ছিল।

বাংলা ও বাঙালির শিল্পসাহিত্য চর্চার এই পটভূমিতে বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বের অবস্থান। বাংলা ছাড়া অন্য ভাষায় কাব্যচর্চা ছিল তৎকালীন বাঙালির বিশেষত্ব। আর বাংলায় লেখা যে সংকলন গ্রন্থটি পাওয়া গিয়েছে তা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের লেখা সাধনসঙ্গীত বা সাধনতত্ত্ব। এছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। লক্ষণীয়, আদিপর্বের এতাবৎ প্রাপ্ত সাহিত্যিক নিদর্শনের প্রথম এবং একমাত্র নিদর্শনটি ধর্মভিত্তিক।

একক ৩ ☐ চর্যাপদ

গঠন

৩.১ আবিষ্কার
৩.২ বিষয়বস্তু ও নাম
৩.৩ ভাষা
৩.৪ পদসংখ্যা ও কবি
৩.৫ সংক্ষিপ্তসার
৩.৬ অনুশীলনী

৩.১ চর্যাপদ আবিষ্কার

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদগুলি। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের আগে বাংলা সাহিত্যের এই নিদর্শনটি অজ্ঞাত ছিল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগারে সংস্কৃত সাহিত্যের পুঁথির সন্ধান করতে গিয়ে ১৯০৭ সালে বাংলা অক্ষরে লেখা একটি পুঁথি দেখতে পান, যার সঙ্গে আরও তিনটি পুঁথি ছিল। এই পুঁথির সঙ্গে তার একটি টীকাও ছিল। টীকাটি সংস্কৃতে লেখা। বাংলা অক্ষরে লেখা পুঁথিটি বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যগণের দ্ব্যর্থক ভাষায় লেখা, যার বাহ্য অর্থ ছাড়াও আভ্যন্তর অর্থ আছে। যাহোক ১৯১৬ সালে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' এই নামে প্রকাশ করেন। এর মধ্যে চারটি পৃথক গ্রন্থ ছিল— 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়', সরহ ও কৃষ্ণাচার্যের দোহা ও 'ডাকার্ণব'। তিনি সবগুলিকেই বাংলা ভেবেছিলেন। পরবর্তীকালে ভাষাতাত্ত্বিকগণ বিচার করে দেখিয়েছেন, একমাত্র 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়'ই বাংলা ভাষায় লেখা। অপরগুলি অপভ্রংশ, অবহট্‌ঠে লেখা।

৩.২ বিষয়বস্তু ও নাম

সংকলন গ্রন্থটির বিষয়বস্তু হল বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের সাধনতত্ত্ব বিষয়ক রচনা। গ্রন্থটির নাম নিয়ে নানারকম মত দেখা যায়। আবিষ্কর্তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এর নাম দিয়েছেন 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়'। কিন্তু এই নাম সকলে মানতে চান না। কেউ বলেন 'আশ্চর্য চর্যাচয়', কেউ বলেন 'চর্যাগীতি কোষ'। এই গ্রন্থের মুনি দত্তের টীকায় এর নাম পাওয়া যায় 'চর্যাগীতি কোষ'। ড. প্রবোধ চন্দ্র বাগচী ও বিধুশেখর শাস্ত্রীর মতে চর্যাগীতিকোষ নামটিই ঠিক। এই সংকলনের তিব্বতী অনুবাদেও চর্যাগীতি কোষ' নামটি ব্যবহৃত। তবে বর্তমানে সংক্ষেপে 'চর্যাপদ' নামেই পরিচিত।

৩.৩ ভাষা

এই সংকলন গ্রন্থটির পদগুলির রচনাকাল নিয়ে মতান্তর দেখা যায়। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের মতে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের কাল দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর। ড. মহঃ শহীদুল্লাহ্

আরো তিন শতাব্দী পিছিয়ে যেতে চান। তাঁর মতে এর রচনাকাল অষ্টম শতাব্দী। সন তারিখের সূক্ষ্ম বিচার অসম্ভব ব্যাপার—ভাষাতাত্ত্বিকগণের মতে মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র হওয়ার কালেই চর্যার গানগুলি রচিত। বর্তমান কালের বাংলার সঙ্গে তার দূরত্ব অনেক। মাগধী অপভ্রংশ থেকে এই বাংলার উদ্ভব, অসমিয়া, ওড়িয়া, মৈথিলীর উৎস মাগধী অপভ্রংশ, সময় কমবেশি কাছাকাছি। তাই বাংলা ছাড়া অন্যান্য ভাষাগুলির সঙ্গে চর্যার ভাষার কিছু কিছু সাদৃশ্য কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। তাই এ সমস্ত ভাষা এবং হিন্দিরও দাবি ছিল চর্যাপদ তাদের ভাষারই প্রাচীন রূপ। কিন্তু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষাতাত্ত্বিকগণ দেখিয়েছেন, অন্যান্য প্রতিবেশী ভাষাগুলির সঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে মিল থাকলেও বাংলারই আদিরূপ চর্যাপদের ভাষা। একথা ড. চট্টোপাধ্যায় তার 'Origin and Development of Bengali Language' গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে দেখিয়েছেন। আর এর ভাষা দ্ব্যর্থব্যঞ্জক (একটি সাধারণ অর্থ, অপরটি গূঢ়ার্থ) বলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একে 'সন্ধ্যা ভাষা' বলেছেন। আবার ভাষার্থের রহস্যময়তার জন্য 'আলো-আঁধারী'-র ভাষাও বলা হয়ে থাকে।

ভাষায় বাংলা ভাষার সঙ্গে নৈকট্য প্রমাণ্য করে এটি বাংলারই আদিরূপ। যেমন, 'নিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী (নিজের ঘরণী চণ্ডালে নিয়ে গেলা), 'উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই শবরী বালী...' (উঁচু উঁচু পর্বত—সেখানে শবরী বালিকা বাস করে, 'ণাণা তরুবর মৌলিল রে গগণত লাগোলী ডালী (নানা তরুবর মুকুলিত হল, গগনে তার ডাল লাগলো), কাহ্নুপার 'তু লো ডোম্বী হাঁউ কপালী/ তোহোর অন্তরে মোত্র ঘণিলি হাড়ের মালী' (তুই ডোম্বী, আমি কপালী, তোর জন্য আমি হাড়ের মালা গ্রহণ করেছি) প্রভৃতি রচনায় বাংলা ভাষার সঙ্গে সম্পর্কের নিবিড়তাই প্রকাশ পায়।

৩.৪ পদ সংখ্যা ও কবি

চর্যাগীতি কোষের টীকাকার মুনি দত্ত ৫১টি পদের কথা লিখলেও একটি পদের টীকা রচনা করেননি। তাই পদসংখ্যা ধরা হয় ৫০টি। 'আর পুথির মধ্যেকার কয়েকটি পাতা নষ্ট হওয়ায় তিনটি সম্পূর্ণ পদ এবং একটি পদের শেষাংশ অপ্রাপ্ত। অতএব পুথিতে সর্বসমেত সাড়ে ছেচল্লিশটি গান পাওয়া গেছে।' [দ্র. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ), সুকুমার সেন, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৭৮। পৃ. ৬৭]

চর্যাপদে মোট ২৪ জন কবির রচনা পাওয়া গেছে। অধিকাংশ পদের শেষেই ভণিতায় কবির নাম পাওয়া যায়। কবিদের নামের সঙ্গে গৌরব সূচক 'পা' যোগ করা হয়েছে। সংস্কৃত টীকা থেকে জানা যায় 'পাদ' থেকে 'পা' শব্দটি এসেছে। কবিদের নামগুলি হল—লুই-পা, ভুসুক-পা, কুক্কুরী-পা, কাহ্ন-পা, ডাম্বী-পা, শান্তি-পা, চাটিল-পা, ঢেণ্ঢন-পা প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে লুই-পা আদি সিদ্ধাচার্য। এদের মধ্যে কুক্করী, বীণা, তন্ত্রী, ডোম্বী, তাড়ক, কঙ্কন প্রভৃতি ছদ্মনাম বলে মনে হয়। অনেকেরই একাধিক পদ সংকলনে আছে, লুই-পার ২টি, ভুসুক-পার ৮টি, কাহ্ন-পার ১৩টি, সরহ পার ৪টি কুক্কুরী পার ৩টি শান্তিপার ২টি শরহপার ২টি এবং বাকীদের একটি করে পদ সংকলনে স্থান পেয়েছে।

এখানে প্রধানত তিনটি ছন্দ ব্যবহৃত। পয়ার, ত্রিপদী ও ১৬ মাত্রার চৌ-পাই ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর এগুলি গাওয়ার জন্য রচিত বলে প্রত্যেক পদের শুরুতে 'রাগ'-এর উল্লেখ রয়েছে। যেমন, প্রথম পদ (লুইপাদের লেখা) রাগ পটমঞ্জরী, পঞ্চম পদ-গুর্জরী রাগের গান।

গানগুলিতে বৌদ্ধদের সাধনতত্ত্বের পরিচয় বাস্তব জীবনের রূপকে প্রকাশিত। তাত্ত্বিক বিষয়কে সামাজিক জীবনের মোড়কে প্রকাশ করা হয়েছে। বাইরে দৈনন্দিন জীবনের ছবি, ভিতরে গূঢ়ার্থ যা সাধারণ পাঠকের জন্য নয়। আর এরই মধ্যে মানবিক আবেদনও অনেক পদেই প্রকাশিত। তাই সিদ্ধাচার্যগণ সাধনার কথা বললেও

সাহিত্যিক রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার ছবি, খেলাধূলা, খাওয়া-পরা সবই এসেছে রূপকের আড়ালে। ঢেণ্ঢণ-পার 'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী' (৭নং পদ), কাহ্নুপার 'নগর বাহিরিরে ডোম্বী তোহোরি কুড়িয়া' (১০ নং পদ), 'তোহোর অন্তরে মোএ খলিলি হাড়ের মালী', ভুসুকু পার 'আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী/ নিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী।' ইত্যাদি অংশে ধর্মীয় উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে কবিদের এক মানবিক আর্তিই বড় হয়ে উঠেছে।

প্রসঙ্গত আমরা চর্যাপদ-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, এর পদ, বিষয়বস্তু, রচনাকাল প্রভৃতি সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচক তথা তাত্ত্বিকদের মতামত উদ্ধৃত করি যাতে বিষয়টি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবেন। অধ্যাপক অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করি।

"একটু দুর্বোধ্য রহস্যময় ভাষায় এই পদগুলি রচিত হয়েছে। এর হেঁয়ালি ভাষার নাম 'সন্ধ্যাভাষা'—যার অর্থ, যে-ভাষা রহস্যময় এবং যা বুঝতে বিলম্ব হয় অথবা, যার অর্থ সম্যক ধ্যানের (সম্-ধৈ ধাতু) দ্বারা বুঝতে হয়, তা 'সন্ধ্যাভাষা বা 'সন্ধাভাষা'। এই পথের পথিক ভিন্ন চর্যাপদের তাৎপর্য আবিষ্কার সহজ নয়। 'চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়ে' সংযুক্ত মুনি দত্ত কৃত সংস্কৃত টীকাটি না থাকলে এর তাৎপর্য চিরদিন দুর্বোধ্যই থেকে যেত। অন্য সম্প্রদায়ের প্রতিকূল ব্যক্তি বা গোঁড়া ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, যাঁরা সহজিয়া বৌদ্ধদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না তাঁদের শ্যেনচক্ষু থেকে থেকে এই গূঢ় ধর্মাচারকে আড়াল করে রাখার জন্যই বৌদ্ধতান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যেরা এইরকম 'সন্ধ্যাভাষা'র ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন।

"চর্যাপদে বজ্রযান ও সহজযানের গূঢ় ধর্ম, সাধনপ্রণালী ও দর্শনতত্ত্ব নানাধরনের রূপক-প্রতীক ও চিত্রকল্পের দ্বারা আভাসে-ইঙ্গিতে ব্যঞ্জিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের মহাযান মত কালক্রমে নানা উপধর্মে (যেমন—বজ্রযান, কালচক্রযান, মন্ত্রযান, সহজযান) বিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু সাধনতত্ত্বে এদের নানা মতপার্থক্য থাকলেও নির্বাণ সম্বন্ধে এরা সকলেই এক লক্ষ্য ছিলেন। বাস্তব জীবনের জরামরণ ও পুনর্জন্মের বিষচক্র পার হয়ে নির্বাণলাভেই বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র। এঁরাও সেই পথের যাত্রী। তবে সেই পথে পৌঁছতে গিয়ে পদকর্তারা নানাপ্রকার গূঢ় তান্ত্রিক আচার আচরণে উল্লেখ করেছেন যা অবলম্বন করলে সাধক অতি সহজে নির্বাণে পৌঁছে যেতে পারেন। এঁরা সাধনভজনের তত্ত্বকথা বললেও অল্পবিস্তর কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ভাষা ছন্দ ও রূপ নির্মিতিতে এদের যে বেশ দক্ষতা ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। বুদ্ধিগ্রাহ্য দার্শনিকতা ও রহস্যময় আচার আচরণকে অনেকস্থলেই এঁরা কাব্যলোকে উন্নীত করেছেন। নির্বাণতত্ত্বকে কোন কোন পদকর্তা নিজের দয়িতা রূপে বর্ণনা করেছেন; তাই নির্বাণলাভের আকাঙ্ক্ষা কাব্যমন্ত্রে পরিশুদ্ধ হয়ে প্রিয় সঙ্গ কামনায় রক্তিম হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি এই সমস্ত পদগুচ্ছে তৎকালীন সাধারণ (সময়ে সময়ে হীন অন্ত্যজ) বাঙালির প্রতিদিনের ধূলিমলিন জীবনচিত্র, সুখদুঃখ, হাসিকান্নার টুকরো টুকরো রেখাচিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে।" [দ্র. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা। ১৯৯০। পৃ. ১৫-১৬]

অধ্যাপক নীলরতন সেন তাঁর সম্পাদিত 'চর্যাগীতিকোষ' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন চর্যাপদের ভাষা ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে। তার কিছুটা উদ্ধৃত করা যাক—

"চর্যাগীতের বিষয়বস্তু বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মভিত্তিক। অধিকাংশ গীত মরমী ভাবদ্যোতক (Mystic)—'সন্ধাভাষা অর্থাৎ সন্ধানী বা মরমী ভাষায় রচিত। গীতগুলিতে অনেক সংকেতধর্মী শব্দ ববহৃত হয়েছে; যাঁরা তার মর্মার্থ জানেন গীতগুলিতে বর্ণিত সহজ সাধনার রহস্য তাঁরাই ধরতে পারেন। ...

চর্যাগীতগুলি এবং তার টীকা অবলম্বনে সহজ ভাবনার ধারাটি মোটামুটি নিম্নভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।—মন্ত্রতন্ত্র, জপতপ বা ধ্যান ব্যাখ্যানের দ্বারা মুক্তি লভ্য নয়। মুক্তির সহজপথ গুরুর সাহায্যেই খুঁজে

পাওয়া সম্ভব। পাপপুণ্য, সুখদুঃখ, সত্যমিথ্যা, ভালমন্দ—সবই মানুষের চপল মনের কল্পনা। কারো ক্ষেত্রেই মানুষের স্বাভাবিক রিপুগুলি অস্বীকারের প্রয়োজন নেই। শুধু গুরুর নির্দেশমতো দেহমনকে সংযত করতে শিখতে হয়। 'সহজ'কে উপলব্ধির সোপানে নিজেকে উন্নীত করতে হয়। একবার সেখানে পৌঁছাতে পারলে যথার্থ মুক্তির আনন্দ উপভোগ সম্ভবপর।...

"মরমী গীতগুলির বহিরঙ্গ বর্ণনায় পূর্বভারতীয় প্রাকৃতিক বর্ণনা এবং তৎকালীন নর-নারীর জীবনের ও এই অঞ্চলের মানব সমাজের নানা চিত্র ফুটে উঠেছে। মনে হয়, তখনো গ্রামীণ সমাজ ছিল মুখ্যত কৃষিভিত্তিক। গ্রামগুলি অধিকাংশ নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল। যাতায়াতের মুখ্য বাহন ছিল নৌকা। এই নৌকার হাল, লগি, গলুই, পাল, গুণ, নোঙর প্রভৃতি নানা অংশের বর্ণনা চর্যাগীতে পাওয়া যায়। নৌকা চালানোর কিছু পদ্ধতিও বর্ণিত হয়েছে। সম্ভবত নিরাপত্তার জন্য অধিকাংশ অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা গ্রামের কেন্দ্রস্থলে বাস করতেন। ডোম, চণ্ডাল, শবর প্রভৃতি নিম্নজাতের লোকেরা গাঁয়ের প্রান্তে বাস করত। কৃষি মুখ্য জীবিকা ছিল, অন্যান্য জীবিকার মধ্যে মাঝির কাজ, তাঁত বোনা, ধুনুরির কাজ, বন্য হরিণ শিকার, কাঠুরের কাজ, ডালা, কুলা তৈরি প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। একশ্রেণির স্ত্রীলোকের মধ্যে নৃত্যগীত, মদ তৈরি করে বিক্রয় করা, ইন্দ্রজাল দেখানো, এমনকি বারাঙ্গনাবৃত্তি অবলম্বন জীবিকার উপায় রূপে গণ্য হত। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অধিকারে যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি থাকত; ঘরে যথেষ্ট সোনারূপা থাকত বলে চোর ডাকাতেরও ভয় ছিল। অন্যদিকে এমন পরিবারও ছিল যাদের দুবেলা আহার জুটত না।"

এতক্ষণ আমরা চর্যাপদ নিয়ে যতটুকু আলোচনা করলাম বা বিশিষ্টজনের মতামত তুলে ধরলাম, তা সবই চর্যাপদগুলির অনুসারী। তাই আলোচনার উৎস সেই পদগুলি থেকে দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে :

১. 'টলিতে মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাঁড়িতে ভাত নাই নিতি আবেশী।।' —টিলার উপর আমার ঘর, আমার হাঁড়িতে ভাত নেই অথচ নিত্য পড়শির আনাগোনা।

২. 'নগর বাহিরিরে ভোম্বী তোহোর কুড়িয়া।
ছোট ছোট জাখ সো বাহ্ম নাড়িয়া।'—নগরের বাইরে ডোমনীর কুড়ে ঘর। সেখানে লুকিয়ে লুকিয়ে ব্রাহ্মণ বা সম্ভ্রান্ত লোকেরা যাতায়াত করে।

৩. "কানৌ চৌরী নিল আধরাতি।"— মাঝরাতে চোরে কানের গয়না চুরি করে নিয়ে গেল।

৪. 'অদঅ বঙ্গালে দেশ লুড়িউ'। নির্দয় বঙ্গালে দেশ লুঠে নিল।

৫. "সোনে ভারতী করুণা নাবি।
রূপা যেই নাহিক ঠাবি।'—সোনায় ভর্তি করুণা নৌকা, রূপা রাখবার জায়গা নেই।

৬. 'ভবনই গহন গম্বীর বেগে বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী।'—ভবনদী গম্ভীর বেগে বয়ে চলেছে। তার দুধারে কাদা। মাঝে থা (থই) নেই।

৭. "নানা তরুবর মেলিল রে।
গঅনত লাগেলি ডালি।।"—নানা তরুবর মুকুলিত হল। গগনে লাগল তাদের ডালপালা।

৩.৫ সংক্ষিপ্তসার

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ।

আবিষ্কার: মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থশালা থেকে পুথিটি আবিষ্কার করেন।

মুদ্রিত আকারে প্রকাশ: ১৯১৬ সালে (বঙ্গাব্দ ১৩২৩) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত।

সম্পাদক প্রদত্ত শিরোনাম: হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা।

প্রকৃত নাম: প্রবোধচন্দ্র বাগচী এবং বিধুশেখর শাস্ত্রীর মতে—চর্যাগীতি কোষ।

টীকাকার: মুনি দত্ত।

পুথি ও পদসংখ্যা: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থের চারটির মধ্যে একমাত্র 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' গ্রন্থটির বাংলার আদি পর্বের নিদর্শন। মোট প্রাপ্ত পদ সংখ্যা—সাড়ে ছেচল্লিশটি। পুথিটিতে মোট ৫০টি পদ ছিল। সাড়ে তিনটি পাওয়া যায়নি।

কবিগণ: মোট ২৪ জন পদকর্তার নাম পাওয়া যায়।

বিষয়বস্তু ও ভাষা: সহজিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্ব সাংকেতিক ভাষায় ও রূপকের সাহায্যে প্রকাশিত।

রচনাকাল: ভাষাতাত্ত্বিকগণ বিভিন্ন বিষয় বিচার করে এই সংকলনের পদগুলির রচনাকাল ১০ম থেকে ১২শ শতাব্দী বলে সিদ্ধান্ত নেন। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এগুলিকে ১০ম শতকে রচিত বলে মনে করেন। ড. শহীদুল্লাহ একে ৭ম-৮ম শতাব্দীর বলে মনে করেন।

বিশদভাবে জানার জন্য আরও গ্রন্থ:

১। সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড, মূর্ধার্ধ)
২। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড)
৩। ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম খণ্ড)
৪। নীহাররঞ্জন রায় : বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)
৫। Suniti Kumar Chatterjee : Origin and Development of Bengali Language

৩.৬ অনুশীলনী

বিস্তৃত বিশ্লেষণাত্মক উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন—

১। বাংলা সাহিত্যের আলোচনার সুবিধার্থে তাকে কয়টি যুগে ভাগ করা হয়েছে, তার পরিচয় দিন।
২। বঙ্গদেশ বা বাংলার সীমানা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৩। প্রাচীন বাংলাদেশে বাঙালির সাহিত্যচর্চা বিষয়ে আলোচনা করুন।
৪। বাংলাভাষায় রচিত প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন কী? গ্রন্থটির আবিষ্কার, প্রকাশের পরিচয় দিন।
৫। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদে'র রচনাকাল, পদসংখ্যা, পদকর্তা, টীকাকার সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা দিন।
৬। বাংলা সাহিত্যের আদি যুগ সম্পর্কে ধারণা দিন।

৭। বঙ্গদেশের চতুঃসীমার পরিচয় দিন।

৮। বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় বাঙালির সাহিত্যকৃতির পরিচয় দিন।

৯। চর্যাপদগুলি রচনার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পটভূমি ব্যাখ্যা করুন।

১০।বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় যে যুগবিভাগ করা হয়েছে তার পরিচয় দিন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন—

১। চর্যাপদের আসল নাম কী? পদকর্তার সংখ্যা কত?

২। চর্যাপদে মোট কতগুলি পদ ছিল এবং প্রাপ্ত পদের সংখ্যা কত?

৩। চর্যাপদের টীকাকারের নাম কী? তিনি কয়টি পদের টীকা রচনা করেন?

৪। বাংলা সাহিত্যের আর্দি নিদর্শন কোনটি? এটিকে কোথা থেকে আবিষ্কার করেন?

৫। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কোন যুগের নিদর্শন?

৬। 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়' গ্রন্থটি প্রথমে কী নামে প্রকাশিত হয়? গ্রন্থটির সংকলয়িতার নাম কী?

৭। 'দায়ভাগ' ও 'স্মৃতি মীমাংসা' গ্রন্থ দুটির রচয়িতার নাম লিখুন।

৮। দুজন 'রামচরিত' লিখেছেন, তাঁদের নাম লিখুন।

৯। চর্যাপদের ভাষা কোন সময়ের?

নোটস্

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

মডিউল : ২

আদি-মধ্যযুগ

একক ৪ ❐ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য
৪.২ প্রস্তাবনা
৪.৩ কাব্য সম্পর্কিত আলোচনা
৪.৪ কবি সমস্যা
৪.৫ কাব্যের ধরন
৪.৬ চরিত্র আলোচনা
৪.৭ সংক্ষিপ্তসার
৪.৮ অনুশীলনী

৪.১ উদ্দেশ্য

বাংলা সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের এই এককের মাধ্যমে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য সম্বন্ধে একাট ধারণা দেওয়া এর উদ্দেশ্য। এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা এই কাব্য সম্বন্ধে সবকিছু জানতে পারবেন। তাঁরা কাব্যের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন।

৪.২ প্রস্তাবনা

এই পর্যায়ে তুর্কী আক্রমণ ও বিজয়ের পর বাংলা সাহিত্য জগতে যে বন্ধ্যা দশা দেখা দিয়েছিল, বাংলার সমাজজীবনে হতাশার যে কালো অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল—সেই সময়ে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য বাংলা সাহিত্য জগতে যে আলোক বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছিল সে সম্পর্কিত আলোচনা এখানে পাওয়া যাবে। কাব্যটির আবিষ্কার, প্রকাশ, তার বিভিন্ন খণ্ডের মধ্যে লৌকিক জীবনের ভাবনা, দেহাতীত প্রেমের আর্তি বিশেষভাবে লক্ষ করা যাবে। তৎকালীন সমাজচিত্র, নাটকীয়তা, চরিত্রচিত্রণ, ভাষাভঙ্গীও এখানে আলোচনার বিষয় হিসাবে গুরুত্ব পাবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্যের নতুন গতিপথের সন্ধান পাবেন।

৪.৩ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য সম্পর্কিত আলোচনা

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তুর্কি আক্রমণ ও পরবর্তীতে মুসলমান শাসনের অত্যাচারে সারা দেশে বিপর্যয়ের কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে। সে সময়ে মানুষের জীবন-প্রাণ বিপন্ন। সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারা সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত না হলেও ক্ষীণ ধারায় চলছিল। অনেকেই তুর্কি আক্রমণোত্তর এই প্রাক্‌চৈতন্য (আনুমানিক ১২০০-১৫০০ খ্রিস্টাব্দে) পর্বকে অন্ধকার যুগ বা অনুর্বর পর্ব নামে অভিহিত করেন। কারণ এই সময়ে রচিত কোনো সাহিত্যের নিদর্শন সেভাবে পাওয়া যায়নি। কিন্তু পাওয়া যায়নি বলেই যে রচিত হয়নি একথাও সুনিশ্চিতভাবে

বলা যায় না। তাই দীর্ঘ বছর পর আদি-মধ্যযুগ বা প্রাক্‌চৈতন্য পর্বের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিদর্শন স্বরূপ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর আবিষ্কার এক চঞ্চল্যকর ঘটনা। সুতরাং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যকে উপেক্ষা করে বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক পাঠ সম্ভব নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে (১৩১৫ বঙ্গাব্দ) বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরের কাছে কাঁকিল্যা গ্রাম শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশধর দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়াল ঘরের মাঁচা থেকে অযত্নে রাখা অনেকগুলো পুঁথির মধ্য থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর খণ্ডিত পুঁথিটি খুঁজে পান। পরবর্তীতে বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে এই পুঁথি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে প্রকাশিত হয়। এই একটি মাত্র খণ্ডিত পুঁথির প্রথম, মধ্যের ও শেষের দিকের বেশ কয়েকটি পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। ফলে কাব্যের নাম, রচয়িতা ও লিপিকাল কোনো কিছুই সুনির্দিষ্ট ভাবে জানা সম্ভব হয়নি। যে কারণে অনুমানের উপর ভিত্তি করেই কাব্যের নামকরণ, রচনাকাল, কবির নাম ইত্যাদি নির্ণয় করতে হয়েছে আর ফলস্বরূপ এই কাব্য নিয়ে জটিলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুমান নির্ভর হওয়ায় বিভিন্ন গবেষক তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

পুঁথির মধ্যে একটি ছিন্ন কাগজে এই কাব্যকে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব' বা 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' বলা হয়েছে। কিন্তু এই নামই যে লেখক দিয়েছিলেন তা সুনিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। যেহেতু এই পুঁথি রাধা-কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক তাই বসন্তরঞ্জন রায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাম দিয়েই প্রকাশ করেন। কাব্যটি ১৩টি খণ্ডে (জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, বস্ত্রহরণখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ) এবং ৪১৫ মতান্তরে ৪১৮টি পদ নিয়ে রচিত। রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। তবে এই চণ্ডীদাস নামকে ঘিরেও বিভ্রান্তি ও মতবিরোধের শেষ নেই। তুলট কাগজে লেখা এই পুঁথিকে তিন ধরনের হস্তাক্ষর দেখতে পাওয়া যায়। তাই এই পুঁথি একজনের হাতে লিখিত নাকি বহু অংশ প্রক্ষিপ্ত, না কয়েকজন কবির ভাবনা-চিন্তার মিলিত ফসল তা নিয়ে দ্বিধা ও মতভেদ রয়েছে। অনুমান করা হয় পুঁথিখানি বিষ্ণুপুরের রাজার গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মনে করেন বিষ্ণুপুরের কোন ব্রাহ্মণ লিপিকরের হাতের লেখা এই পুঁথিতে রয়েছে। পরবর্তীতে ওই লিপিকরের কোনো সহকারী কর্মচারী এবং তারপর কোনো সাধারণ কর্মচারীর হাতের লেখা পুঁথিতে থাকা সম্ভব। এ পুঁথি রচনার সঠিক কাল নির্দেশ করা সম্ভব না হলেও ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে চর্যাপদের ঠিক পরবর্তী স্তরের ভাষার লক্ষণ এই কাব্যে পরিলক্ষিত হয়। 'ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই কাব্যের ভাষাকে খ্রিস্টিয় বারো থেকে পনেরো শতকের বাংলা ভাষার প্রতিনিধি বলে মনে করেছেন। খুব সম্ভবত এই লিপি বিষ্ণুপুর অঞ্চলে লিখিত হয়েছিল। তবে গবেষকরা এই পুঁথির ভিন্ন ভিন্ন কাল নির্দেশ করেছেন। সুকুমার সেন প্রথমে মনে করেছিলেন ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের দিকেই এ কাব্য লিখিত হয়েছে। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করে বলেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দের শেষার্ধ।' ঐতিহাসিক ও প্রাচীন লিপি বিশারদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতো পণ্ডিত ব্যক্তিরা ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তেরোটি খণ্ড সম্বলিত এই কাব্যে শেষ খণ্ড 'রাধাবিরহ' ছিল অসমাপ্ত। ২২৬ পৃষ্ঠার পর খণ্ডিত এই পুঁথির সমাপ্তি কেবল রাধার বিরহ বেদনায় নাকি শেষপর্যন্ত রাধা কৃষ্ণের মিলন সংঘটিত হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে বলার উপায় নেই। তবে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, সতীশচন্দ্র রায় প্রমুখ ব্যক্তি মনে করেন 'রাধাবিরহ'-র পরেও একটি খণ্ড ছিল, তার পৃষ্ঠা হয়তো পাওয়া যায়নি। আদি-মধ্যযুগের কাব্য সম্পর্কে নানামত পাওয়া গেলেও এই কাব্যের 'পদগুলি ভাবে চৈতন্য-পূর্ববর্তী হবার সম্ভাবনা তার ভাষাও যথেষ্ট প্রাচীন, তার লিপির ছাঁদও বেশ পুরনো। সম্ভবত সত্যই রচিত হয়ে থাকবে খ্রি. ১৪৫০-১৫০০-এর মধ্যে।' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি

আবিষ্কারের ১০০ বছরেরও বেশি পার হয়ে যাওয়ার পরেও এই কাব্য নিয়ে ধোঁয়াশা আজও সম্পূর্ণভাবে কাটেনি। আগামী দিনে আরো অনুসন্ধিৎসু গবেষণা সব ধোঁয়াশা কাটিয়ে নতুন আলোর সন্ধান দেবে নিশ্চয়ই।

৪.৪ কবি সমস্যা

চণ্ডীদাস বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি তাঁর লেখনি নৈপুণ্যে পাঠক চিত্তে আজও চিরন্তন হয়ে রয়েছেন। কিন্তু এই মর্মস্পর্শী লেখক ঠিক কোন সময়ের এবং কতজন চণ্ডীদাস রয়েছেন তা নিয়েই নানা তর্ক-বিতর্ক, বিভ্রান্তি, মতান্তর ও মতবিরোধ। চণ্ডীদাসের নামে অসংখ্য পদের সন্ধান মিলেছে। বসন্তরঞ্জন রায় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুঁথি আবিষ্কার করার পর থেকে চণ্ডীদাস সমস্যার জটিলতা যেন আরো বৃদ্ধি পায়। চণ্ডীদাসের নামে একাধিক রাধাকৃষ্ণের বিষয় সম্পর্কিত পদ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে সুকুমার সেন বলেছেন—'চণ্ডীদাসের ভণিতায় প্রায় দুই হাজারের কাছাকাছি পদ পাওয়া যায়।' এইসব বিভিন্ন পদে চণ্ডীদাসের নামে যে সকল ভনিতা পাওয়া যায় তা হল—আদি চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস, অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস ইত্যাদি। তবে এটা কী একজন কবির ভিন্ন ভিন্ন নাম নাকি একাধিক কবি চণ্ডীদাস নাম ধারণ করে পদ রচনা করেছেন তা সুনিশ্চিত ভাবে বলা সম্ভব নয়। চণ্ডীদাস প্রাকচৈতন্য পর্বের নাকি চৈতন্য সমসাময়িক না পরবর্তীকালের সে বিষয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। সনাতন গোস্বামী তাঁর 'শ্রীমৎভাগবত'-র টীকা 'বৈষ্ণব তোষিণী'-তে চণ্ডীদাসের নৌকাখণ্ড ও দানখণ্ডে উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এ উল্লেখ করেছেন মহাপ্রভু নীলাচলে থাকা অবস্থায় চণ্ডীদাসের পদ, স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ রায়ের সাহায্যে আস্বাদন করতেন। 'অন্তত দুজন বা তিনজন পদকর্তা চণ্ডীদাস নামে পদ রচনা করে থাকবেন। তাঁদের মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস, তিনিই সম্ভবত 'আদি চণ্ডীদাস'; তিনি প্রাক-চৈতন্য যুগের কবি।' এবং 'দ্বিতীয়জন দ্বিজ চণ্ডীদাস—তিনি চৈতন্যের হয় সমসাময়িক, না হয় অল্প পরবর্তী। পদাবলীর অধিকাংশ উৎকৃষ্ট পদই তাঁর রচনা। তৃতীয় জন ছিলেন 'দীন চণ্ডীদাস'—যিনি খ্রি. ১৭৫০-এর দিককার লেখক।' অধ্যাপক মুহাম্মদ শহীদুল্লা মনে করেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা এবং তিনি অন্য কোন পদ রচনা করেননি। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক যেসব বৈষ্ণব পদ রয়েছে তা অন্য কোনো চণ্ডীদাসের রচনা হতে পারে। 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' (প্রথম সংখ্যা)-য় মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ 'বড়ু চণ্ডীদাসের পদ' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাহিরে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ নাই। বড়ু চণ্ডীদাস বিভিন্ন কবিতা হিসাবে পদাবলী রচনা করেন নাই।' আবার মনীন্দ্রমোহন বসু পদাবলীর চণ্ডীদাস বলতে দীন চণ্ডীদাসকেই বুঝিয়েছেন। ঠিক অন্যদিকে ড. সুকুমার সেন চণ্ডীদাসকে অত্যন্ত ক্ষীণ কবিত্বশক্তি সম্পন্ন পদকর্তা বলেছেন—'প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে নিতান্ত বাজে মাল অনেক কিছুই আছে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কিন্তু 'দ্বিজ' বা 'দীন' চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত অনেক পদের মত অবিমিশ্র জঞ্জাল অন্য কোন ভাষার প্রাচীন সাহিত্যে আছে বলিয়া অবগত নহি।' চণ্ডীদাসের বাসস্থানকে ঘিরেও নানা মতপার্থক্য রয়েছে। চণ্ডীদাস একজন কবি না হলে তাঁর বাসস্থানও একাধিক জায়গায় হবে এটাই স্বাভাবিক। বীরভূমের নানুর গ্রামকে যেমন চণ্ডীদাসের বাসস্থান বলে মনে করা হয়, তেমনি বাঁকুড়ার অন্তর্গত ছাতনা গ্রামও এই গৌরব দাবিদার। 'চণ্ডীদাসের একটি পদে নান্নুরের নিকটে শালতোড়া গ্রাম এবং তথায় নিত্যাদেবীর উল্লেখ আছে। ছাতনার চারি পাঁচ ক্রোশ পূর্বের শালতোড়া নামে গ্রাম আছে, এবং তথায় নিত্যাদেবীর আলয় আছে। নান্নুর ও ছাতনা দুই জায়গাতেই একাধিক প্রমাণ ও তথ্য পাওয়া গেছে। তাই ঠিক কোন অঞ্চলে চণ্ডীদাসের জন্ম ও বাসস্থান ছিল নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব হয়নি। এসব তথ্য থেকে মনে হয় যদি প্রাক্‌চৈতন্য পর্বে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

কাব্য রচিত হয়ে থাকে তবে চৈতন্য পরবর্তীতে চণ্ডীদাস ভণিতায় যে সকল বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হয়েছে তাঁরা দুজনে এক নন। এত দীর্ঘ বছর ধরে একজন ব্যক্তির পক্ষে বেঁচে থাকাটা অস্বাভাবিক ও অবিশ্বাস্য। অন্ততপক্ষে দু'জন বা তিন জন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব আছে বলে পণ্ডিতরা মনে করেন।

৪.৫ কাব্যের ধরন

এই কাব্যের ধরন নিয়ে নানা মতান্তর আছে। 'জাগের গান', 'ঝুমুর গান', 'ধামালি' ইত্যাদি। তবে—'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য মূলত আখ্যানকাব্য, কিন্তু নানা স্থানে নাট্য ও গীতিকাব্যের স্পর্শ আছে'। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ১৩টি খণ্ডে ৪১৫টি (মতান্তরে ৪১৮) পদে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়োপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। সমগ্র কাব্যটি কাব্যনাট্য লক্ষণাক্রান্ত। রাধা-কৃষ্ণ ও বড়ায়ি পারস্পরিক সংলাপ ও কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কাহিনির পথচলার সূচনা ও সমাপ্তি ঘটেছে। আগেই বলেছি, এ কাব্যের কাহিনি অনেকখানি নাট্যধর্মী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে কৃষ্ণ, রাধা ও বড়ায়ি-এই তিনটি চরিত্রের ভিতর রাধার মধ্যে সবথেকে বেশি অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে রাধা চরিত্রটি বিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে। নাটকে খুব দ্রুত পট-পরিবর্তন হতে দেখা যায়। এই কাব্যের মধ্যেও সেই লক্ষণ সুস্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রথম খণ্ড থেকে পর পর খণ্ডগুলির নামের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়ে যায় কাহিনি কত দ্রুত অগ্রসর হয়েছে। কবি তাঁর সমস্ত বক্তব্য চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন, তিনি কাহিনির মধ্যে কোথাও নিজে প্রবেশ করেননি যা নাটকের একটি অন্যতম ধর্ম বলা যায়। তাই এই কাব্যকে শুধু মাত্র কাব্য না বলে নাট্যকাব্য বলা অধিক সমীচীন বলে মনে হয়। কাব্যে কবির সংগীত চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যের বিভিন্ন জায়গায় বড়ু চণ্ডীদাস বিভিন্ন ধরনের শাস্ত্রীয় রাগরাগিণীর উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজেই পদের উপরে রাগ তাল উল্লেখ করে দিয়েছেন। যেমন—আহের, মালব, গৌড়ী, বেলাবলী, বসন্ত ইত্যাদি। তাই এই কাব্যকে নাটগীতিও বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সঙ্গে ঝুমুরের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। ঝুমুরে যেমন শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য দেখা যায় তেমনি এই কাব্য আদিরসাত্মক। এ কাব্য গঠনে বড়ু চণ্ডীদাস বিভিন্ন ধরনের পয়ারের ব্যবহার করেছেন। কোথাও প্রচলিত চোদ্দ অক্ষরের পয়ার, কোথাও দীর্ঘ ত্রিপদী, উপাঙ্গ জাতীয় স্তবক, কোথাও আবার লাচাড়ি ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়।

৪.৬ চরিত্র আলোচনা

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে আর একটা নতুন দিগন্ত খুলে গেল। এই কাব্যের ভাষা, কাহিনি বয়ন এবং আখ্যান এক আধুনিক বার্তা বহন করে। সেই সঙ্গে বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়োপখ্যানকে অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্যে অঙ্কন করেছেন। আদি মধ্যযুগের একটি কাব্য কৃষ্ণকথার নব নির্মাণে পাঠককুলকে যেন চমকে দিল। এ কাব্যে অত্যাচারী রাজা কংসের নিষ্ঠুর দমন-পীড়নের হাত থেকে প্রজাকে রক্ষা করতে ও কংসের বিনাশের জন্য মর্ত্যে মানব রূপে কৃষ্ণের জন্ম, বড়ায়ির মুখে রাধার রূপ বর্ণনা শুনে রাধার প্রতি কৃষ্ণের প্রণয়াসক্তি, কৃষ্ণের জোরপূর্বক রাধাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, রাধা কর্তৃক প্রথমে কৃষ্ণের প্রণয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ও পরবর্তীতে কৃষ্ণপ্রেমে রাধার আত্মসমর্পণ এবং শেষে কৃষ্ণবিচ্ছেদে রাধার আকুল বিরহ যন্ত্রণা কবির অসাধারণ কথাচিত্রে প্রস্ফুটিত হয়েছে। অন্যান্য চরিত্রের উল্লেখ থাকলেও মূলত রাধা, কৃষ্ণ ও বড়ায়ি—এই তিনটি চরিত্রের সংলাপ ও কথোপকথনের মাধ্যমে আখ্যানের সূচনা ও সমাপ্তি ঘটেছে। স্বর্গীয়

দেবদেবী রাধা-কৃষ্ণ চণ্ডীদাসের লেখনি স্পর্শে বাস্তব জীবনের গ্রাম্য যুবক যুবতীতে পরিণত হয়েছে। তিনটি চরিত্রই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

রাধা :

এ কাব্যে সবথেকে বেশি আকর্ষণীয় ও পরিবর্তিত চরিত্র রাধা। বাঙালি নারীর সার্থক রূপায়ণ রাধার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এগারো বছরের প্রেম। অনভিজ্ঞা রাধা নপুংসক আইহনের স্ত্রী। এক সাধারণ গ্রাম্য গৃহবধূর মতোই তাঁর অতি সাধারণ জীবন যাপন। তবে রাধা অপূর্ব সুন্দরী আর রাধার এই রূপ সাগরে ডুব দিয়েছে কৃষ্ণ। তাই বড়ায়ির মাধ্যমে কৃষ্ণ তাঁর হৃদয়ের আর্তি যথা প্রণয় প্রস্তাব রাধার কাছে পাঠিয়েছিল। কিন্তু সামান্য গৃহবধূ রাধা আত্মসম্মান রক্ষার্থে কৃষ্ণের এরূপ প্রস্তাবকে ক্রোধের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে। পাশাপাশি রাধা কৃষ্ণকে বার বার মনে করিয়ে দিয়েছে রাধা, সম্পর্কে কৃষ্ণের মাতুলানী। সুতরাং তাঁদের মধ্যে প্রণয় সম্ভব নয়। কিন্তু কৃষ্ণ এত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয়, সে তাই ইচ্ছাকৃত ভাবে সে নানা প্রকারে রাধাকে বিপাকে ফেলে তাঁর দেহ দাবি করে বসে। যুবতী রাধা নিজেকে বাঁচানোর হাজার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ প্রেমের জোয়ারে আত্মসমর্পণ করে। কৃষ্ণ নিজের দৈবী স্বরূপ সম্পর্কে অবগত থাকলেও রাধা তাঁদের পূর্বজন্ম সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ বিস্মৃত। তাই কৃষ্ণের প্রতি রাধার এই সমর্পণ কোনোরূপ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে নয়, এক বঞ্চিত ব্যর্থ নারীর যৌবনের ও জীবনবোধের পূর্ণতা প্রাপ্তির অন্বেষণে। তবে কৃষ্ণ প্রেম রসে সম্পূর্ণ আত্মনিমগ্ন হওয়ার পর কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে রাধার হৃদয়-বেদনা-ব্যাকুলতা এক মানবিক রূপ লাভ করেছে। রাধার বিলাপের সঙ্গে চৈতন্যোত্তর যুগের মাথুর বা ভাবসম্মিলনের মিল পাওয়া যায়। কাব্যের 'বংশীখণ্ড' ও 'রাধাবিরহ' অংশে কৃষ্ণ প্রেমে নিমজ্জিত রাধার অস্থির চিত্তের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে এই ছত্রে—

'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।

আবার 'রাধাবিরহ' অংশে পাওয়া যায়—

'যঁবে কাহ্ন না মিলিহে করমের ফলে।
হাথে তুলিআ মো খাইবোঁ গরলে।'

এই কাব্যে রাধার মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন, বিকাশের মধ্য দিয়ে কবির সুতীক্ষ্ম সমাজ বাস্তবচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। তুর্কি আক্রমণোত্তর কালে সমাজজীবনে নারীর যে জীবন সংগ্রাম, পুরুষ কর্তৃক লাঞ্ছনা, অবমাননা ও নারীর হৃদয়ের অসহনীয় ব্যথার চিত্র তা চণ্ডীদাসের অসাধারণ কথাচিত্রে রাধার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। রাধা কেবলমাত্র আর দেবী থাকেনি সে ওই সমাজের নারীর মূর্তরূপ হয়ে উঠেছে। চণ্ডীদাস রাধা চরিত্র অঙ্কনে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন এবং রাধা অজান্তেই পাঠক চিত্তকে জয় করে চিরন্তন হয়ে উঠেছে।

কৃষ্ণ :

সমগ্র কাব্য জুড়ে বড়ু চণ্ডীদাসর কৃষ্ণ চরিত্রটিকে এক অনুদূর, সংকীর্ণচিত্তের, দেহজ কামসর্বস্ব এক গ্রাম্য যুবক রূপে চিত্রিত করেছেন যেখানে কৃষ্ণের সমস্ত দৈবী মহিমা ভুলুণ্ঠিত হয়েছে। অত্যাচারী রাজা কংসের বিনাশের জন্য মানব রূপে কৃষ্ণের জন্ম হলেও তার মধ্যে কোনো বীরসুলভ মহৎ চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায় না। রাধার প্রতি তাঁর কামাতুর লোলুপ দৃষ্টি, নিজের প্রেমজালে রাধাকে ফাঁসানোর জন্য যে প্রবঞ্চনা বা ছলনার আশ্রয় সে নিয়েছিল তাতে কৃষ্ণের অমার্জিত বিকৃত রুচির বহিঃপ্রকাশই ঘটেছে। কৃষ্ণের মধ্যে উগ্র কামুকতা, ইচ্ছাপূরণে ব্যর্থ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের কুটিল ইচ্ছা ছাড়া বিশেষভাবে কোনো মানবিক সৎগুণের সন্ধান পাওয়া

যায় না। কৃষ্ণের মায়ের কাছে গিয়ে রাধা কৃষ্ণের বিরুদ্ধে নালিশ জানালে ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ প্রতিশোধস্পৃহা বশত রাধাকে পুষ্প বাণে আহত করেছে। নিজের দেহসর্বস্ব কামাতুর প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে রাধাকে নানাভাবে বিপদের ফেলতেও দ্বিধাবোধ করেনি সে। সমগ্র কাব্য জুড়েই রাধার প্রতি দেহ কামনার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া কোনো রকম প্রীতি স্নেহ ভালোবাসার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়নি। যদিও সে তাঁর পূর্বজন্ম সম্পর্কে অবগত থাকলেও তাঁর চরিত্রের মধ্য দিয়ে কখনোই ঈশ্বর সুলভ আচরণ বা আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়নি। রাধা তাঁর রূপ-যৌবন কৃষ্ণকে সমর্পণ করতে না চাইলে কৃষ্ণকে অত্যন্ত কটু মন্তব্য করতেও শোনা যায়—

'তোমার যৌবন রাধা কৃপিণের ধন।
পোটলি বান্ধিআঁ রাখা নহুলী যৌবন।।'

এছাড়াও কৃষ্ণ রাধাকে কখনো 'নটকী', আবার 'ছিনালী', 'গোয়ালী' বা 'পামরী' ইত্যাদি নামে গালিগালাজও করেছে। রাধার প্রতি কৃষ্ণের প্রেম যদি সত্যিকারের এক প্রেমিক চিত্তের প্রণয় বাসনা জনিত হৃদয়াবেগ হতো তাহলে বাঁশির খোঁজ না পেয়ে কৃষ্ণ কিছুতেই রাধাকে প্রাণ নাশের ভয় দেখাতে পারত না।

'যবেঁ না না দিবি বাঁশী ভাণ্ডিবি আহ্মারে।
এখনি পরাণ তোর লৈবোঁ অবিচারে।'

কৃষ্ণের এ উক্তি তাঁর লম্পট চরিত্রকে আরও সুস্পষ্ট রূপে তুলে ধরেছে। রাধাকে তাঁর নিজের প্রেমরসে রাঙিয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে একজন ন্যায়-নীতি বিবেকহীন যুবকের পলায়নী মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছে সে। ঐশ্বরিক তাৎপর্য বাদে কৃষ্ণ চরিত্রটি অঙ্কনে বড়ু চণ্ডীদাসের গ্রাম্য আদিরসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এই কাব্যের নাম শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হলেও কৃষ্ণের গুণকীর্তন নামমাত্র নেই। কৃষ্ণ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য মানবরূপে জন্ম গ্রহণ করলেও তাঁকে এইসব নিম্ন প্রবৃত্তির কাজকর্মেই ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। আসলে কৃষ্ণ চরিত্রটির মাধ্যমে বড়ু চণ্ডীদাসের সমকালীন সমাজ জীবনের পুরুষশাসিত সমাজ ও নীতিহীন মানুষের চিত্রই অঙ্কন করতে চেয়েছেন। তাই আদিরসাত্মক এই কাব্যে কৃষ্ণ একটি স্থূল চরিত্রে পরিণত হয়েছে।

বড়ায়ি:

কাব্যে বড়ায়ি রাধা কৃষ্ণের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী সেতু হিসেবে কাজ করেছে। সম্পর্কে সে রাধার মায়ের পিসি। অল্পবয়স্কা রাধার দেখাশোনার জন্য আইহন কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিল বড়ায়ি। সে রাধাকৃষ্ণের দৈবী স্বরূপ ও পূর্ব জন্মের সকল বৃত্তান্ত সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপেই অবগত ছিল। তাই দুজনের মিলনে সে মাধ্যম। কৃষ্ণের কাছে রাধার রূপ বর্ণনা, রাধার কাছে কৃষ্ণের গুণগান, কৃষ্ণের প্রণয় প্রস্তাব রাধাকে প্রেরণ আবার কখনো রাধাকে নানা অজুহাতে বাড়ির বাইরে নিয়ে এসে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়া, তাদের মিলনে সহায়তা এই সবকিছুতেই বড়ায়ি সাহায্য করেছে। আধ্যাত্মিক বা ঐশ্বরিক দিক থেকে দেখলে বড়ায়ি রাধা-কৃষ্ণের প্রেম সম্মিলনের আয়োজক, ভগবানের দূতি কিন্তু বাস্তবে সামাজিক দিক থেকে দেখলে সে কুট্টিনি, পরকীয়ায় সাহায্যকারী নীতিহীন এক চরিত্রের অধিকারী। তাঁর কথাবার্তা, মানসিকতায় গ্রাম্য স্থূলতার পরিচয় ফুটে ওঠে। 'তবুও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নীতিহীন এক চরিত্রের অধিকারী। তাঁর কথাবার্তা, মানসিকতায় গ্রাম্য স্থূলতার পরিচয় ফুটে ওঠে। 'তবুও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়ায়ি শেষ পর্যন্ত কুট্টনীই রহিয়া যায় নাই। গোড়ায় সে কৃষ্ণের দূতী কিন্তু পরিণামে সে রাধারই বড় মা, রাধার জন্য 'আমি যাই করি মোর আকুল পরাণ'—তাহার অন্তরের কথা।' তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে বড়ায়ি তাই যুগের প্রতিনিধি স্বরূপ। ফলে—'বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণকথা লিখতে গিয়ে ভাগবতের পথ ধরলেন না। জয়দেবের আদর্শ অনুসরণ করলেন। সে আদর্শের সঙ্গেই ছিল বাংলার নিজস্ব রীতি ও বিশ্বাসের যোগ।'

৪.৭ সংক্ষিপ্তসার

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যগ্রন্থটি আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার প্রামাণ্য নিদর্শন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিদর্শন স্বরূপ গ্রন্থটির আবিষ্কার এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। বসন্তরঞ্জন রায় কর্তৃক গ্রন্থটির আবিষ্কার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশ। প্রকাশের পরপরই চণ্ডীদাস সমস্যার সৃষ্টি। ১৩টি খণ্ডে কাব্যটি লেখা। রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই—এই তিন চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাব্যের ঘটনাধারা নাটকীয় গতিতে প্রবাহিত হয়েছে। সংলাপ গীতিময় নাট্যগীতি শ্রেণীর কাব্যরূপে এটি দৃষ্টি আকর্ষণকারী। কাহিনি সৃষ্টিতে কবি গ্রামীণ রাধা-কৃষ্ণ কাহিনির আদর্শের দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। কৃষ্ণচরিত্র তৎকালীন অশিক্ষিত অমার্জিত গ্রাম্য রাখাল চরিত্রের আদলে রচিত। বড়াই টাইপ চরিত্র। রাধা চরিত্রের ক্রমবিকাশ মনস্তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণধর্মী। তবে কবি ঘটনা কৌশলে সহজ সরলা রাধার মনে কামনার আগুন জ্বালিয়েছেন। কাব্যে সমসাময়িক সমাজজীবনের বাস্তব চিত্র আছে।

৪.৮ অনুশীলনী

বিস্তৃত বিশ্লেষণাত্মক উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন—

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের গুরুত্ব বিচার করুন।
২। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের আবিষ্কারের কাহিনি আলোচনা করুন।
৩। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রাধা চরিত্রের বিবর্তন সম্পর্কে লিখুন।
৪। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কৃষ্ণচরিত্র আলোচনা করুন।
৫। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে নাট্যলক্ষণ কতখানি প্রস্ফুটিত হয়েছে তা আলোচনা করুন।
৬। বড়ায়ি চরিত্রের গুরুত্ব বিচার করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন:

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাকাল নিয়ে যে মতান্তর সে বিষয়ে আলোকপাত করুন।
২। চণ্ডীদাস সমস্যা বিষয়ে আলোচনা করুন।
৩। কুট্টিনী চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৪। টীকা লিখুন: শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ।

একক ৫-৬ ❐ অনুবাদ সাহিত্য: রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত

গঠন

৫-৬.১ উদ্দেশ্য
৫.২ প্রস্তাবনা
৫.৩ অনুবাদ সাহিত্য রচনার কারণ
৫.৪ রামায়ণ
৫.৫ রামায়ণের বাঙালিয়ানা
৬.১ মহাভারত : কবি ও কাব্য পরিচিতি
৬.২ ভাগবত : কবি ও কাব্য পরিচিতি
৬.৩ সংক্ষিপ্তসার
৬.৪ অনুশীলনী

৫-৬.১ উদ্দেশ্য

অনুবাদ সাহিত্য সম্পর্কিত এই এককটি পড়লে মূল সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে বাংলা ভাষায় অনূদিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ সম্পর্কে জানা যাবে। গ্রন্থগুলি কোন্ ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে রচিত—কোন কোন রচনাকারের দ্বারা কীভাবে এগুলো সমৃদ্ধ হয়েছে তা জানতে পারবেন। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদকদের নাম ও তাঁদের রচনা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যাবে। অনুবাদক কৃত্তিবাস ওঝা, কাশীরাম দাস ও মালাধর বসু-র কবিজীবন সম্পর্কে জানা যাবে। বাংলা অনুবাদ শাখায় ওইসব লেখকদের অবদান, লেখকদের ভাবনা, তাঁদের রচনাশৈলীর মৌলিক পার্থক্য এবং কাব্যগুলির জনপ্রিয়তা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে।

৫.২ প্রস্তাবনা

মধ্যযুগে বাংলাদেশ সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত বাংলাভাষায় অনূদিত হবার ফলে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই অনুবাদ-সাহিত্য বাঙালির চিন্তা-চেতনার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সংস্কৃত ভাষায় রচিত মূল রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত গ্রন্থকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে এগুলিকে সাধারণ বাঙালি পাঠকের কাছে আস্বাদন যোগ্য করে তোলার চেষ্টা করা হয়।

এই এককে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবেন তুর্কী আক্রমণের ফলে বিদেশি পাঠান সুলতানদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় কীভাবে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ভিত গড়ে ওঠে। তাছাড়া হতমান জাতীয় জীবনে আলোচ্য ত্রয়ী অনুবাদ কাব্য বাঙালি মানস বিবর্তনে কীভাবে প্রেরণা জুগিয়েছে তারও ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

কাব্যের অনুবাদকেরা হুবহু আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি। তাঁরা মূল গ্রন্থাদির বিষয়াদি সংক্ষেপে করে, কোথাও বা নতুন ঘটনা-কাহিনি সংযোজন করে তা বাঙালির হৃদয়ের সামগ্রী করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এগুলো পয়ার ত্রিপদী ছন্দে রচিত। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালি

ও মালাধর বসুর ভাগবত রচিত হয়। কাশীরাম দাসের মহাভারতের রচনাকাল সপ্তদশ শতকের প্রথম দশক। আলোচ্য অংশে কৃত্তিবাস ওঝা, কাশীরাম দাস এবং মালাধর বসুর অবদান এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যাতে তাঁদের সৃষ্টির কথা শিক্ষার্থীর জানার জগতকে সমৃদ্ধ করবে।

অনুবাদ সাহিত্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনুবাদ সাহিত্য এক নবদিগন্তের সূচনা করেছে বলা যেতে পারে। দশম-দ্বাদশ শতকের চর্যাপদকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে ধরা হয়। যদিও তা ছিল মূলত বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধন ভজনের পদ। সন্ধ্যাভাষায় রচিত এই চর্যাপদের গুরুত্ব অনেক। এতদ্‌সত্ত্বেও বাঙালির আত্মিক স্বর মধ্যযুগের গতানুগতিক ধারার মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হয়েছিল। তার মধ্যে অনুবাদ সাহিত্য একটি অন্যতম প্রধান দিক। প্রাক্‌চৈতন্য পর্বে বা পঞ্চদশ শতকে অনুবাদ সাহিত্যের শুভ সূচনা হলেও চৈতন্য পরবর্তীকালে কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন কবি এই অনুবাদ কাজে মনোনিবেশ করেছেন। সংস্কৃত ভাষার কঠিন ঘেরাটোপ পেরিয়ে বাঙালি মাতৃভাষায় কাব্য রচনা করতে শুরু করল। প্রথম দিকে বাংলার নিজস্ব শব্দভাণ্ডার, ভাষাশৈলী কোন কিছুই পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকায় সংস্কৃতের অনুসরণে ও সংস্কৃত থেকে ধার করা শব্দের সাহায্য নিয়ে সাহিত্য রচনা করতে হয়েছিল। ক্রমে মাতৃভাষা সমৃদ্ধ হয়ে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠে। বহু কবি একই রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের কাহিনি নির্বাচন করে নিজস্ব রচনাশৈলীতে অনুবাদ করে গেছেন। 'এ যেন পুরাতন কাব্যের কাঠামোয় নবযুগ-ভাবনার প্রাণ সঞ্চার।

৫.৩ অনুবাদ সাহিত্য রচনার কারণ

তুর্কি আক্রমণোত্তর ধ্বস্ত বাঙালির জীবনধর্মে অনুপ্রাণিত করতে, তাদের মনোবল বাড়াতে, অদম্য সাহসিকতায় বলীয়ান করে তুলতে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত-এর মতো বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনির অনুবাদ একান্তই প্রয়োজন ছিল। বিভিন্ন সংস্কৃত, পুরাণ, ধর্মগ্রন্থ থেকে অতীত গৌরবের ঐতিহ্যময় আদর্শবোধকে বাঙালির সামনে তুলে ধরে তাকে নতুনভাবে জেগে ওঠার মন্ত্রে দীক্ষিত করে তুলতে এই অনুবাদ সাহিত্যের ধারা গড়ে ওঠে। এছাড়াও-সংস্কৃতের প্রভাব, ওজস্বিতা কেবলমাত্র উচ্চকোটি ও উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় তা আপামর জনসাধারণের বোধগম্যের বাইরে ছিল। বাংলায় সহজ, সরল পাঁচালি আকারে এইসব বীরত্বব্যঞ্জক ধর্মীয় কাহিনির অনুবাদ সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে আস্বাদ্য হয়ে উঠল। অনুবাদ সাহিত্য রচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বেশিরভাগ অনুবাদক তাঁর কাব্য রচনার কারণ স্বরূপ বা অনুপ্রেরণা হিসেবে রাজাদেশ বা রাজানুগত্যের কথা জানিয়েছেন। কেউ কেউ রাজার নাম উল্লেখ করে প্রশংসায় পঞ্চমুখও হয়েছেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, সমকালীন শাসকগণ মুসলমান ধর্মাবলম্বী হলেও হিন্দু পুরাণ অনুবাদে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। সম্ভবত পুরাণের রাজরাজড়াদের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনি, রণাঙ্গনে বীর সেনাদের যুদ্ধকৌশল তাঁদেরকে আকৃষ্ট করেছিল। পাশাপাশি এ সকল শাসকগণের উদারতা, ধর্মীয় সহনশীলতাকে সম্মান জানাতে হয়। অনুবাদকেরা সাহিত্য রচনার থেকে ধর্মীয় কাহিনির প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তাই ধর্মীয় গ্রন্থের নানা কাহিনির অনুবাদের প্রতি তাঁরা যত্নবান হয়েছেন। সাহিত্য সৃষ্টির তুলনায় ধর্মীয় রস সঞ্চারে তাঁরা ব্রতী ছিলেন। তাদের অনুবাদ বেশিরভাগই আক্ষরিক অনুবাদ বা ভাবানুবাদেই সীমাবদ্ধ ছিল, মৌলিকতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় না। এই অনুবাদ সাহিত্যের মধ্য দিয়েই প্রথম পাঁচালি আকারে কাব্য লেখার সূচনা হয়।

অনুবাদের ক্ষেত্রে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এই তিনটি গ্রন্থ গুরুত্ব পেল কেন? একদিকে যেমন বীররসের যুদ্ধকথা রাজা ও অমাত্যদের উৎসাহিত করেছে। পাশাপাশি সাধারণ বাঙালি সমাজের চাহিদা বুঝে—স্মার্ত হিন্দু সম্প্রদায়, অন্ত্যজ হিন্দুদের মধ্যে ভক্তিভাব ও অবতার রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচারের তাগিদে অনুবাদ কর্মে উৎসাহিত হয়েছিল।

৫.৪ রামায়ণ

'রামায়ণ'-এর কথায় আসার আগে কৃত্তিবাসের জন্মসাল সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়া জরুরি। বাল্মীকি রচিত 'রামায়ণ'-এর বাংলা অনুবাদ কৃত্তিবাস রচিত 'শ্রীরাম পাঁচালী' বাঙালি জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। কৃত্তিবাসের ভক্তিরসের গাঢ় প্রবাহের সঞ্জীবিত সুধায় শ্রোতাকুল উদ্ভাসিত হয়েছে। প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জনের মধ্য দিয়ে কৃত্তিবাস পাঠক চিত্তে চিরন্তন হয়ে আছেন। কৃত্তিবাস অত্যন্ত বুদ্ধিধর ও পণ্ডিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও কাব্যের মধ্য কোথাও তিনি নিজের সময়কালকে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। যে কারণে তাঁর জন্মসাল, কাব্য রচনাকাল সবকিছু নিয়ে এক ধোঁয়াশা, জটিলতা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। কৃত্তিবাস নিজের জন্মবৃত্তান্ত বলতে কেবলমাত্র বলেছেন—

'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য (পূর্ণ) মাঘ মাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।'

অর্থাৎ, মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে, রবিবারে কৃত্তিবাসের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু ঠিক কত খ্রিস্টাব্দে, কোন সময়ে তাঁর জন্ম হয়েছিল ও কবে তিনি তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছেন তা তিনি নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেননি। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় ১৩৩৭, ১৩৯৮ ও ১৪৩২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যে-কোনো একটা বছরে কৃত্তিবাসের জন্ম হয়েছিল বলে মনে করেন। 'দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বিভিন্ন কুলজীগ্রন্থের সাক্ষ্যাদি বিশ্লেষণ করে বলতে চান চতুর্দশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের শেষপ্রান্তে কৃত্তিবাসের জন্ম হওয়া সম্ভব। এর সঙ্গে জ্যোতিষগণনা মিলিয়ে মাঘ মাস, রোববার এবং শ্রীপঞ্চমী তিথির সাযুজ্য দেখতে পান ১৩৭২ এবং ১৩৭৫ সালে।' কৃত্তিবাসের পিতার নাম বনমালী এবং মাতা মালিনী। তিনি বারো বছর বয়সে বিদ্যার্জনের জন্য উত্তরদেশে পড়তে যান এবং দেশে ফিরে গৌড়েশ্বরের আদেশে রামায়ণ রচনা করেন। কাব্যে উল্লেখ—

'এগারো নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তরদেশ।।
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ।'

কিন্তু তিনি কোন্ রাজার সভায় গিয়েছিলেন সে কথা জানাননি। তবে কাব্য মধ্যে তিনি রাজসভার যে বর্ণনা দিয়েছেন, রাজার সভাসদদের নাম জানিয়েছেন তা থেকে মনে হয় কৃত্তিবাস কোন হিন্দু রাজসভায় গিয়েছিলেন ও রাজার আনুগত্য লাভ করেছিলেন। গৌড়েশ্বরের একমাত্র হিন্দু রাজা ছিলেন রাজা গণেশ, যার রাজত্বকাল ১৪১৪ থেকে ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল। এই মতকে মেনে নিলে কৃত্তিবাসের রামায়ণ এই সময়ের মধ্যেই রচিত হয়েছিল বলেই মনে হয়। আবার এ প্রসঙ্গে—'রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন যে কৃত্তিবাস ১৪৬০ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৩৮-৩৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার কাব্য রচনা করেন।' ফলে কবি কৃত্তিবাসের জন্মসাল ও কাব্যরচনাকাল নিয়ে স্থির কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছন যায় না।

৫.৫ রামায়ণের বাঙালিয়ানা

বীররসের রামায়ণ থেকে এই রামায়ণ হয়ে উঠল বাঙালি ঘরের কাব্য। কৃত্তিবাস মূলত বাল্মীকি রামায়ণের ভাবানুবাদ করেছেন। তিনি তাঁর কাব্যে রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনি যেমন বর্জন করেছেন তেমনি আবার নিজস্ব মৌলিকতায় অনেক নতুন কাহিনির সংযোজনও ঘটিয়েছেন। তাঁর মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়—দশরথের রাজ্যে শনির দৃষ্টি, গণেশের জন্ম, কৈকেয়ীর বর লাভ, গুহকের সঙ্গে বন্ধুত্ব, বীরবাহুর যুদ্ধ, দেবীর অকালবোধন ইত্যাদি অংশে। আবার বাল্মীকি রামায়ণের কার্তিকের জন্ম, বিশ্বামিত্রের কথা প্রভৃতি কাহিনি তিনি পরিত্যাগ করেছেন। কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণ ছাড়াও অন্যান্য পুরাণ থেকে কাহিনি সংগ্রহ করে নিজস্ব শৈলীতে তা নতুনভাবে বর্ণনা করেছেন। অনেকেই মনে করেন কৃত্তিবাস অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ গ্রন্থকে অনুসরণ করে তাঁর অনুবাদ কাব্য 'শ্রীরাম পাঁচালী' রচনা করেছিলেন। তবে এ অনুমানের কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কৃত্তিবাসের এই কাব্যে ধর্মীয়চেতনা ও ভক্তিরস এতখানি প্রবল হয়ে উঠেছে যে সেখানে রামায়ণের বীরত্বের কাহিনি, শক্তির ক্ষমতা, রাজকীয় আতিশয্য, আড়ম্বর ম্লান হয়ে পড়েছে। কৃত্তিবাস সমকালীন বাঙালি জীবন, সমাজচেতনা বাস্তবতাকে এ কাব্যে রূপদান করছেন। তাই রামায়ণের বীরযোদ্ধারা এ কাব্যে বাঙালি গৃহস্থ পরিবারের সন্তান হয়ে উঠেছে। এই কাব্যের মধ্যে বাঙালির খাদ্যাভ্যাসের অসাধারণ বর্ণনা চিত্রিত হয়েছে। চরিত্র অঙ্কনে তাঁর বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। রামের বীরত্বমহিমা, ঐশ্বর্য, রণকৌশল-নীতি, অসম্ভব শক্তিতে ভরপুর এক যোদ্ধার স্বরূপের পরিবর্তে তাঁর উদার, সহনশীল মনোভাবকে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। ফলে রাম যেন গ্রাম বাংলার মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি থাকা মানবে রূপান্তরিত হয়েছেন। মহাকাব্যের গুরুগম্ভীর ভাষা, যুদ্ধের দামামা, প্রচণ্ড প্রতাপশালী রাজ-রাজড়াদের রণাঙ্গনে যুদ্ধ মত্ততা রামায়ণের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও কৃত্তিবাসের হাতে অনেকখানি নিষ্প্রভ হয়েছে। কিন্তু তাঁর লেখনী স্পর্শে এ কাব্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে এবং খুব সহজে পাঠক চিত্তকে জয় করেছে। 'মহাভারত হয়েছে বাঙালির সম্ভ্রমের বস্তু আর রামায়ণ তার মনের সামগ্রী'।

একক : ৬ মহাভারত ও ভাগবত

৬.১ মহাভারত : কবি ও কাব্য পরিচিতি

ব্যাসদেব রচিত মহাভারতের অনুবাদ বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। অষ্টাদশ পর্বের এই মহাকাব্য বাঙালির জীবনের অন্যতম প্রধান সম্পাদ হয়ে উঠেছে। প্রাকচৈতন্য, চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর পর্বে বহু কবি মহাভাররেত অনুবাদ করেছেন। এই ধারায় প্রাচীনতম কবিদের মধ্যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন। হুসেন শাহের (রাজত্বকাল ১৪৯৩-১৫১৯) লস্কর পরাগল খাঁ ত্রিপুরা রাজ্য জয় করে চট্টগ্রামে অধিষ্ঠিত হয়ে বসেন। পরাগল খাঁ মহাভারতের কিছু বিক্ষিপ্ত কাহিনি শুনে এ কাব্যের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁর সভাকবি কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে মহাভারতের অনুবাদ করার জন্য অনুরোধ জানান—

'এই সব কথা কহ সংক্ষেপ করিয়া
দিনেক শুনিতে দিতে পারি পাঁচালী রচিয়া।'

রাজ আনুকূল্য পেয়ে কবীন্দ্র অত্যন্ত সংক্ষেপে মহাভারতের কাহিনির মূলানুবাদ করেছেন। এই কাব্যে তাঁর

মৌলিকতা দেখানোর পরিসর বা পরিস্থিতি ছিল না। তিনি রাজার মনোরঞ্জনের জন্য কেবল মহাভারতের কাহিনির বর্ণনা অতি সংক্ষেপে সমাপ্ত করেছেন। কবীন্দ্র রচিত এই মহাভারত 'পরাগলী মহাভারত' নামে পরিচিত। আবার কেউ কেউ একে 'পাণ্ডববিজয়' ও 'বিজয়পাণ্ডব' নামেও অভিহিত করে থাকেন। শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় এই অনুবাদ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। সম্ভবত কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের আদি অনুবাদক বা প্রাচীন কবি। তিনি পূর্ববঙ্গর চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের পুঁথি চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, গোয়ালপাড়া, কোচবিহার, বগুলা প্রভৃতি অঞ্চলে পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গে তাঁর বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল। তবে 'গৌরীনাথ শাস্ত্রীর মতে কবীন্দ্র কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের মন্ত্রী ছিলেন।' গৌরীনাথ শাস্ত্রীর মতে কবীন্দ্র তাঁর উপাধি। কিন্তু কবীন্দ্র পরমেশ্বর কাব্যের সর্বত্রই রাজা হুসেন শাহ ও পরাগল খাঁ-এর উল্লেখ করেছেন।

পরাগল খাঁর পুত্র নুসারৎ খাঁ (তিনি ছুটি খান নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন) হুসেন শাহের আমলেই চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হয়েছিলেন। তিনিও উদার মানসিকতা সম্পন্ন ও গুণগ্রাহী রাজা ছিলেন। মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের কাহিনির প্রতি ছুটি খান আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সভাকবি শ্রীকর নন্দীকে মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব অনুবাদ করতে বলেন। তখন শ্রীকর নন্দী 'জৈমিনি সংহিতার' অনুকরণে এই পর্বের বিস্তৃত আলোচনা করেন। অনেকের অনুমান কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী একই ব্যক্তি। আবার অন্য একটি মতে জানা যায়—'বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করেছেন শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর দুইজন পৃথক ব্যক্তি নহেন। শহীদুল্লাহ এই একই মত পোষণ করেন। এই সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা দু'জন নয় একজন কবিকেই জানি। কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের সমগ্র কাহিনির সম্পূর্ণ অনুবাদ করেছিলেন সেখানে অশ্বমেধ পর্বের কাহিনি সংক্ষিপ্ত আকারে রয়েছে অন্যদিকে শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধ পর্ব বিস্তৃত আকারে বর্ণনা করেছেন। তবে কোনো কোনো পুঁথিতে একই সঙ্গে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর ভনিতা পাওয়া গেছে বলে অনেকে দুজনকে এক মনে করেছেন। কিন্তু এই অনুমান কতখানি যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

মহাভারতের অনুবাদক হিসেবে কবি সঞ্জয়ের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এই সঞ্জয় নামকে ঘিরে নানান মতবিরোধ, মতান্তর রয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেন সঞ্জয়কে মহাভারতের আদি অনুবাদক বলে মনে করেন। তাঁর মতে কবীন্দ্র পরমেশ্বর সঞ্জয়কে অনুসরণ করে মহাভারত অনুবাদ করেছেন। আবার বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ও নগেন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্রের বিরোধী মত পোষণ করে জানান সঞ্জয় বলে কোন কবির অস্তিত্বই ছিল না। সুখময় মুখোপাধ্যায় সঞ্জয়ের অস্তিত্বকে স্বীকার করে বলেন—'সঞ্জয় কোনরূপ রাজাদেশে মহাভারত অনুবাদ করেননি। তিনি উড়িষ্যার সরলা দাসের মতোই জনসভার কবি'। সঞ্জয় নামে কোন কবি মহাভারত অনুবাদ করে থাকলেও তিনি সম্ভবত অল্প কবিত্ব সম্পন্ন লেখক ছিলেন। সঞ্জয়কে ঘিরে এই জটিলতা, বিভ্রান্তি বাংলা সাহিত্যে 'সঞ্জয় সমস্যা' বলে খ্যাত।

মহাভারতের বাংলা অনুবাদক হিসেবে বর্ধমান জেলার কবি কাশীরাম দাস সর্বশ্রেষ্ঠ। সম্ভবত সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে তিনি এই অনুবাদ করেছিলেন যা প্রায় ৪০০ বছর ধরে বাঙালি পাঠক চিত্তে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। কাশীরাম দাসের মহাভারতের অমৃত কথা আজও বাঙালি মানসপটে অমৃতসম। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর এক সনেটে কাশীরাম দাস সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন—

'মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
হে কাশী কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান।'

কাশীরাম কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তবে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় সম্পর্কে বিশেষভাবে আর কিছু

জানা যায়নি। কাশীরাম দাস সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ করে যেতে পারেননি। কিন্তু কতখানি অনুবাদ করে রেখে যান তা নিয়ে মতবিরোধ আছে। আদিপর্ব ও সভাপর্ব তিনি সম্পূর্ণ অনুবাদ করেছিলেন এ বিষয়ে কোনো মতান্তর নেই কিন্তু অনেকে মনে করেন তিনি বনপর্ব সমাপ্ত করে বিরাট পর্বের খানিকটা রচনা করে দেহত্যাগ করেছেন। আবার সুখময় মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে জানান—'অক্ষয়বাবুর (অক্ষয়কুমার কয়াল) গবেষণা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে কাশীরাম দাস আদি, সভা ও বিরাট-এই তিনটি পর্বের রচনা সম্পন্ন করেন; বনপর্ব বিরাটপর্বের পূর্ববর্তী হলেও কাশীরাম দাস বিরাটপর্ব রচনা শেষ করবার পরে বনপর্ব রচনা শুরু করেন এবং বনপর্ব অসম্পূর্ণ রেখে তিনি মারা যান।'

'আদি সভা বিরাট বনের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর।"

কাশীরাম দাসের মহাভারতে পরবর্তীকালে অনেক কবির লেখা সংযোজিত হয়েছে বলে মনে হয়। কবি নন্দরাম দাস নিজেকে কাশীরাম দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র বলে পরিচয় দিয়ে তাঁর অসমাপ্ত অনুবাদ কবি কর্তৃক সম্পন্ন করার আদেশের কথা জানিয়ে কাশীরামের মহাভারতের অনুবাদ কার্য সমাপ্ত করেন। গোপাল হালদার এ প্রসঙ্গে বলেন—'প্রবাদ আছে, কাশীরাম 'আদি, সভা, বন, বিরাটের কতদূর' লিখেই স্বর্গপুরে যান, এবং অষ্টাদশ পর্ব সমাপ্ত করেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম দাস।' এছাড়া কৃষ্ণানন্দ বসু, জয়ন্ত দাস প্রমুখ লেখকের রচনা কাশীদাসী মহাভারত-এ অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলে অনুমান করা হয়। কাশীরাম তাঁর অনুবাদ কর্মের মধ্যে বীররসের সঙ্গে রসের মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। মহাভারতের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, রাজ-রাজড়াদের বীরগাথা যার সঙ্গে বাংলার জনজীবনের সংযোগ প্রায় নেই বললেই চলে, কাশীরাম সেই ঐতিহ্যময় বিশালাখ্যানের অনুবাদে নিজস্ব লেখনি কৌশল ও শৈলীতে বাঙালিয়ানার প্রাণসত্তা আরোপ করেছিলেন। একজন লেখক তখনই সফল হন যখন পাঠক ওই লেখার সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন। কাশীরাম দাস সে কাজে সফল হয়েছিলেন। মহাকাব্যের চরিত্ররা তাঁদের দৈবী মহিমা বজায় রেখেও গ্রাম বাংলার মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি আসতে সক্ষম হয়েছেন। কাশীরাম দাসের লেখা জীবন্ত হয়ে পাঠক চিত্তকে ভক্তিরসের প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর করে তুলেছে। কাশীদাসের শব্দপ্রয়োগ, ছন্দ নির্মাণ, অলঙ্কারের প্রাচুর্য, ত্রিপদী পয়ারে পাঁচালি আকারে লেখা এ কাব্য যুগ থেকে যুগান্তরে স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে রয়েছে। এছাড়াও দ্বিজ রঘুনাথ, ষষ্ঠীধর সেন, রামচন্দ্র খান প্রমুখ কবি মহাভারতে বাংলা অনুবাদ করেছেন

৬.২ ভাগবত : কবি ও কাব্য পরিচিতি

রামায়ণ, মহাভারতের সঙ্গে ভাগবতের অনুবাদও বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ভাগবতের বাংলা অনুবাদ মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে ধরা যায়। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে তিনি মূল ভাগবত থেকে দশম ও একাদশ স্কন্দের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', 'গোবিন্দবিজয়' ও 'গোবিন্দমঙ্গল' নামে পরিচিত। কবি বর্ধমান জেলার কুলিন গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। পিতা ভগীরথ ও মাতা ইন্দুমতী। কাব্যের মধ্যে তিনি লিখেছেন—

'গুণ নাই অধম মুই নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।'

এর থেকে বোঝা যায় কবি কোনো এক রাজার থেকে 'গুণরাজ খান' উপাধি পেয়ে এবং রাজ আনুগত্য

লাভ করে এ কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু কোন গৌড়েশ্বর তাঁকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল সে বিষয়ে তিনি কোন উল্লেখ করেননি। তবে তিনি তাঁর গ্রন্থ রচনা কাল নির্দেশ করে বলেছেন—

'তেরশ পচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভণ।
চতুর্দশ দুই শকে হইল সমাপন।।'

অর্থাৎ কাব্যের রচনা আরম্ভ ১৩৯৫ শকাব্দ = ১৩৯৫ + ৭৮ = ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দ আর গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছে ১৪০২ শকাব্দ = ১৪০২ + ৭৮ = ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে। তিনি সম্ভবত রুকনুদ্দিন বরবক শাহ (রাজত্বকাল ১৪৬৭-১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দ) বা সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ (রাজত্বকাল ১৪৭৫-১৪৮১ খ্রিস্টাব্দ) এই দুজনের মধ্যে যে কোন একজনের আনুগত্য লাভ করেছিলেন। 'স্যার যদুনাথ সরকার সম্পাদিত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত History of Bengal (Vol. 2) গ্রন্থে মালাধরের পৃষ্ঠপোষক রূপে বরবক শাহ্‌কেই গ্রহণ করা হয়েছে।' তবে গ্রন্থটি বটতলা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই কাব্যে মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা, মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি মূল ভাগবতের অনুসরণে অনুবাদ করলেও 'হরিবংশ' ও 'বিষ্ণুপুরাণ'-এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। একটি শ্লোক থেকে অনুমান করা হয় তিনি কথকদের মুখে ভাগবতের কাহিনি শুনে অনুবাদ কার্য সমাপন করেছিলেন। তবে একথা যথার্থ সত্যতা বিচার্য বিষয়। চৈতন্যদেব মালাধর বসু এবং তাঁর কাব্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এ কাব্যের 'নন্দ নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' বাক্য চৈতন্যদেবকে মুগ্ধ করেছিল। মালাধর বসু মূলত—'কৃষ্ণকাহিনীই বলতে চেয়েছেন, বিশেষ করে তাঁর শক্তির কথা, শত্রুজয় ও পাপীবিনাশের প্রসঙ্গ। কবি সংহত কাহিনি বলেছেন এবং সে কাহিনি বীররসাত্মক।' কিন্তু বৈষ্ণবরা কৃষ্ণের প্রেমলীলায় অধিক মুগ্ধ ছিলেন তাই পরবর্তীকালে রাধা-কৃষ্ণ লীলার অনেক প্রক্ষিপ্ত কাহিনি এ কাব্যের সঙ্গে যুক্ত হতে দেখা যায়। সম্ভবত কবি এ সকল কাহিনি লেখেননি। কারণ ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম উপাখ্যান ছিলই না এমনকি রাধার প্রসঙ্গও নেই। মালাধর বসু কাব্যের মধ্যে বাঙালিয়ানাকে নিষ্ঠার সঙ্গে নিপুণভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন। মালাধর বসু ভাগবতের কিছু কিছু তত্ত্বাংশের অনবাদও করেছিলেন। কাব্যে বিভিন্ন রাগ রাগিণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বাঙালির প্রধান খাদ্য ভাতের কথা অনেকবার এ কাব্যে শোনা যায়। মা যশোদা একজন সাধারণ বাঙালি রমণীর মতোই কৃষ্ণকে বলছেন 'ভাত খায়্যা পুনরপি খেলহ আসিয়া'। এছাড়াও কবি কাব্যের মধ্যে শিমুল, পলাশ, নারকেল, তুলসী, মালতি, পদ্ম প্রভৃতি গাছের উল্লেখ করেছেন তাতে গ্রাম বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে বৃন্দাবনের প্রকৃতি যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। মালাধর বসু একজন পরম ভক্ত ছিলেন তাই তার ভক্তিরসের সঙ্গে কবিত্বশক্তির মিলনে এ কাব্য বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে আজও চিরন্তন হয়ে রয়েছে।

৬.৩ সংক্ষিপ্তসার

রামায়ণ-এর বাংলা অনুবাদ কৃত্তিবাস রচিত 'শ্রীরাম পাঁচালী' বাঙালি জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। রামায়ণের আদি কবিরূপে কৃত্তিবাস ওঝা সর্বজন বিদিত। আক্ষরিক অনুবাদ নয়, রচনায় স্বাধীনতার আশ্রয় নিয়ে বাঙালির রুচি অনুযায়ী তিনি কাব্যকে সাজিয়েছেন। তাঁর হাতে সংস্কৃত কাব্যের চরিত্রগুলি বাঙালির ঘরোয়া আদর্শে চিত্রিত হয়েছে। কাব্যটি ভক্তিরসের প্লাবনে ভেসে গেছে এবং বাঙালির চিত্তকে জয় করতে সক্ষম হয়েছে।

মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব রচিত। এটি একটি বিরাট গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে এক বিস্তৃত যুগের সমাজ ও জীবনাদর্শ

উজ্জ্বল রেখায় চিত্রিত। তবে প্রথমদিকে ভক্তিরস প্রিয় বাঙালির কাছে মহাভারতের যুদ্ধ বিগ্রহ কাহিনি তেমন সমাদর পায়নি। মহাভারতে গল্পরস তেমন নেই। ন্যায়, নীতি, রাজধর্ম, প্রজাধর্ম ইত্যাদি নানা তত্ত্ব এবং সেই সঙ্গে কৃষ্ণের মহিমা প্রচারের ফলশ্রুতিতে মহাভারত কাহিনি জটিল হয়ে উঠেছে। বাংলা মহাভারতকার কাশীরাম দাসের নামই বাঙালির কাছে সবচেয়ে বেশি পরিচিত। বাঙালি জীবনের ঐতিহ্যকে কাশীরাম দাস যথার্থভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। কাব্যখানি সুখপাঠ্য এবং হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

ভাগবতের অনুবাদ প্রাক্‌চৈতন্য যুগে শুরু হয়। এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবি মালাধর বসু। তাঁরও কাব্যের প্রচার দেশব্যাপী। কাব্যটি পুরাণ-তত্ত্ব এবং প্রচারধর্মী সাহিত্য। ফলে এর শিল্প সৌন্দর্য তেমন ছিল না। কৃষ্ণের ঈশ্বরযুক্তির তত্ত্বাশ্রয়ী কাব্য ভাগবত মূলত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাব্য। কাব্যে যুদ্ধের ঘনঘটা লক্ষ করা যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর অনুবাদক্রমের জোয়ারের ফলেই কবির মনে যে উৎসাহ ও প্রেরণা দেখা দিয়েছিল, তারই ফলশ্রুতি তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অবলম্বন করেই তিনি কাব্যখ্যানি লেখেন। মূলের প্রতি নিষ্ঠা রেখে বাঙালির নিজস্ব মানসিকতার বহির্প্রকাশ এই অনুবাদে দেখা যায়। পরমভক্ত মালাধর বসুর ভক্তিরস ও কবিত্বশক্তি এ কাব্যে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

৬.৪ অনুশীলনী

বিস্তৃত বিশ্লেষণাত্মক উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন—

১। মধ্যযুগের গতানুগতিক সাহিত্যধারায় অনুবাদ সাহিত্য রচনার কারণ ও গুরুত্ব বিচার করুন।
২। রামায়ণ অনুবাদে কৃত্তিবাস ওঝার কৃতিত্ব বিচার করুন।
৩। কৃত্তিবাস ওঝা অনূদিত রামায়ণের বাঙালিয়ানার পরিচয় দিন।
৪। মহাভারতের অনুবাদে কাশীরাম দাসের শ্রেষ্ঠত্ব আলোচনা করুন।
৫। ভাগবতের অনুবাদে মালাধর বসুর কৃতিত্ব বিচার করুন।
৬। অনুবাদ শাখার তিনটি ধারার মধ্যে রামায়ণ সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন:

১। কৃত্তিবাস ওঝার জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করুন।
২। কৃত্তিবাসী রামায়ণে গ্রহণ-বর্জন-সংযোজন সম্পর্কে লিখুন।
৩। পরাগলী মহাভারত সম্পর্কে টীকা লিখুন।
৪। মহাভারত অনুবাদে পরাগল খাঁ ও ছুটি খানের ভূমিকা নির্ণয় করুন।
৫। মালাধর বসুর কাব্য রচনাকাল সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৬। মালাধর বসুর কাব্যে বাঙালিয়ানা কতটা প্রকাশ পেয়েছে তা আলোচনা করুন।

একক ৭-৮ ❐ বৈষ্ণব পদাবলী: বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস

গঠন

৭-৮.১ উদ্দেশ্য
৭.২ প্রস্তাবনা
৭.৩ বৈষ্ণব পদাবলীর সাধারণ রূপ
৭.৪ বিদ্যাপতি
৭.৫ চণ্ডীদাস
৮.১ জ্ঞানদাস
৮.২ গোবিন্দ দাস
৮.৩ সংক্ষিপ্তসার
৮.৪ অনুশীলনী

৭-৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে শিক্ষার্থীরা চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রাক্‌লগ্নে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের অবদান সম্পর্কে নানা তথ্য জানতে পারবেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবি বৈশিষ্ট্য, তাঁদের কবিস্বভাবের পার্থক্য এবং রচনারীতি সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মাবে। পাশাপাশি চৈতন্যোত্তর যুগের কবি জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের পদাবলীর ধারা, তাঁদের রচনার সৃষ্টি বৈচিত্র্য সম্পর্কে নানা তথ্য শিক্ষার্থীকে সমৃদ্ধ করবে। এককটির মাধ্যমে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দেওয়া এবং প্রাক্‌চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিদের আলোচনার মাধ্যমে পদকর্তাদের সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা সমৃদ্ধ হবে।

৭.২ প্রস্তাবনা : বৈষ্ণব পদাবলী

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদবাবলী স্বর্ণ-ফসলে ভরা এক অধ্যায়। প্রাক্‌চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের এই সাহিত্য শাখাটি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ পদকর্তাদের সৃষ্টির দ্বারা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। বিদগ্ধ রাজসভার কবি বিদ্যাপতি ব্রজবুলি ভাষায় বিচিত্র পদ সৃষ্টি করে বাঙালির হৃদয় জয় করেছেন। সাধক কবি চণ্ডীদাস সহজ সুরে গভীর প্রেমের আর্তি শুনিয়ে পাঠককে অনির্বচনীয় প্রেমালোকে নিয়ে গেছেন। বিদ্যাপতির ভাবাশিষ্য গোবিন্দদাস এবং চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য জ্ঞানদাস। এদের হাতে বৈষ্ণব পদাবলী আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। এই চারজন বৈষ্ণব পদকর্তার সৃষ্টি সম্ভারের মাধ্যমে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন তত্ত্বের শৈল্পিক চেতনার পরিচয় পাওয়া সম্ভব হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা বৈষ্ণব পদাবলীর সাহিত্যের গতিপথের সন্ধান পাবেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবধর্ম, দর্শনের পাশাপাশি বৈষ্ণব কবিরা পদ রচনা করেছেন। যদিও এই পদ রচনারীতি, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগেই কবি জয়দেবের প্রভাবে মিথিলায় ব্রজবুলি ভাষায় গীতিনাট্য রচিত হত। যা চৈতন্যদেব আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করতেন। পাশাপাশি মিথিলায় বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ভাষার পদ এবং বাংলায় চণ্ডীদাসের হাত ধরে পদাবলি বাঙালির জীবনরসকে ভরপুর করে তোলে। কারণ মহাপ্রভু নিজে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের পদের রসাস্বাদন করতেন। ফলে বাঙালির মাতামাতির শেষ ছিল না। এখনও যার ধারা অব্যাহত—সেই পদাবলি সাহিত্যের আবেদনে বাঙালি তার নিজস্ব একটা বিনোদন পেল। 'আধুনিককালের (১৮০০ খ্রি.) পূর্বেকার বাঙলা সাহিত্যের প্রধানতম গৌরব জীবনী-কাব্য নয়, নানা পৌরাণিক কাব্যও নয়, —সে গৌরব বৈষ্ণব গীতিকবিতা বা 'পদাবলী' সাহিত্য।'। বাঙালি তাঁর জীবনাচরণে গীতিধর্মকেই গুরুত্ব দিয়েছে। 'চর্যাপদ'-এর মধ্যেও সেই লক্ষণ স্পষ্ট। স্বাভাবিকভাবেই বাঙালির নিজস্ব এই সম্পদ বিশ্ব সাহিত্যের এক অনন্য সম্পদ বলে পরিগণিত হবার দাবি রাখে। এখন প্রশ্ন হল—কী এই বৈষ্ণবপদ? সমগ্র বাংলাকে যা মোহিত করেছে—'বৈষ্ণব পদাবলী বলিতে যাহা বুঝি তা চৈতন্যের আগে উঁচুদরের বৈঠকি গানের মতোই ছিল। এই গানের আসর ছিল রাজসভায় অথবা ধনীর মজলিশে। রাজসভা হইতে ইহা চলিয়া আসে তখনকার দিনের মার্জিত রুচি সঙ্গীতপ্রিয় শিক্ষিত ব্যক্তির সুহৃদ গোষ্ঠীতে।' বৈষ্ণব-গীতিকবিতাকে এখন 'পদ' বলা হয়। এই অর্থ অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে চলিত হয় নাই। আগে 'পদ' বলিতে দুই ছত্রের গান অথবা গানের দুই ছত্র বুঝাইত। যেমন 'ধ্রুবপদ'। জয়দেব 'পদাবলী' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন, তবে দ্ব্যর্থে। ...অনেককাল পরে, প্রায় আধুনিক সময়ে, যখন 'পদাবলী'র অর্থ দাড়াইলো গীতিকবিতা ও তাহার সংকলন, তাহার আগেই 'পদ'-এর অর্থ পরিবর্তন ঘটিতে শুরু হয়েছে। বৈষ্ণব-পদাবলীর রচয়িতারা অধিকাংশই 'মহাজন' বা 'মহান্ত' (অর্থাৎ সাধুপুরুষ গুরু) ছিলেন। এইজন্য সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাবে গীতিকবিতা 'মহাজন পদাবলী' নামে খ্যাত হয়।'

৭.৩ বৈষ্ণব পদাবলীর সাধারণ রূপ

গৌর-পদাবলী (চৈতন্যলীলা বিষয়ক), ভজন পদাবলী (গুরু বা মহাজনদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা), রাধাকৃষ্ণ পদাবলী (আদিরস ও আধ্যাত্ম রাগের কাব্যধারা), রাগাত্মিকা পদাবলী (গুহ্য সাধনার পদ); এই বিভাজন থেকেই পদাবলি গ্রন্থসমূহে রাধা কৃষ্ণের প্রেম কাহিনির কবিতাগুলি সাজানো। বৈষ্ণব সাহিত্যের নিয়ম অনুযায়ী—'বয়ঃসন্ধি, পূর্বরাগ ও অভিসার, সম্ভোগ, মান, বিরহ, প্রেম-বৈচিত্র্য, আক্ষেপানুরাগ, ভাবসম্মেলন ইত্যাদি অনুক্রম এবং নায়িকা বিভাগের নিয়মে বাধা নানা পার্থক্য অনুযায়ী যথা—কলহান্তরিতা, খণ্ডিতা বিপ্রলব্ধা প্রভৃতি। পদাবলি সাহিত্যের এই বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস অবিসংবাদী হয়ে উঠেছিলেন।

৭.৪ বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতি:

বিদ্যাপতি তাঁর জীবৎকালেই এত বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন যে তিনি 'মৈথিল কোকিল' এবং 'অভিনব জয়দেব' নামে অভিহিত। 'জয়দেবের পরে পূর্বভারতে বিদ্যাপতির মতো কবি আর জন্মাননি।' তিনি বিহারের

মিথিলায় জন্মেছিলেন। একদিকে সংস্কৃতের পাণ্ডিত্য অন্য দিকে রস মাধুর্যময় কবিত্ব শক্তিই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। 'সম্ভবত বিদ্যাপতি কৃষ্ণ ভক্ত ছিলেন না ছিলেন পঞ্চোপাসক, হরগৌরীর প্রতি তাঁর ভক্তি ছিল অকৃত্রিম। অন্তত বিদ্যাপতির সময়ে চৈতন্যদেব জন্মাননি তাই রাধাকৃষ্ণ লীলার গানের সেই আধ্যাত্মিক রূপান্তর বিদ্যাপতির সময় হয়নি। বিদ্যাপতির রাধা কৃষ্ণলীলা, নর-নারীর মিলন বিরহের গান বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণ নর-নারী অনুকল্প বাস্তব জিনিসটির জন্য সংস্কৃত কবিদের মনে লজ্জা যাতনা দেহাতীত, এতে তাদের বিশেষ কোনো আগ্রহ ছিল না বিদ্যাপতি ও এই ভারতীয় ইতিহাসের কবি ও কাব্য সঙ্গীত মাধুর্যের অধিকারী কবি' এ প্রসঙ্গে তিনি আরো জানিয়েছেন 'মিথিলা তখন ন্যায় এর প্রধান কেন্দ্র। বাঙালি ছাত্ররা সেখানে অধ্যায়ন করতে যেতেন। বিদ্যাপতির পদাবলী শুনতেন মুগ্ধতা নিয়ে ফিরতেন। তখনও মৈথিলী ও বাংলা ভাষার পার্থক্য দুস্তর নয়। দেখতে না দেখতেই বিদ্যাপতির পদ তাই বাংলায় বিস্তৃত হয়। চৈতন্যদেবের সমকালে দেখি মিথিলার কবি বিদ্যাপতি বাংলার কবি বাঙ্গালির নিকট পরিচিত হয়ে গিয়েছেন।' বিদ্যাপতির রচনা মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে বিদ্যাপতির অনুকরণে বাঙালি পদকর্তা অন্যরূপ ভাষায় পদ রচনা মেতে উঠলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাই এই ভাষার মাধুর্যে আকৃষ্ট হন এবং ব্রজবুলিতে লেখেন 'ভানুসিংহের পদাবলী'। বাঙালির লিখিত এই অনুকাব্য ভাষাও যে বাংলা ভাষায়ও প্রভাব পড়বে তা স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে—'ব্রজবুলি বিদ্যাপতির সৃষ্টি নয়। তিনি মৈথিলিতেই পদ লিখেছিলেন। পরে পদগুলি বাংলা, অসম, ওড়িয়া, নেপাল প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচারিত হলে এতে অনেক স্থানীয় ভাষা প্রবেশ করার ফলে একটা কৃত্রিম ভাষা প্রচলিত হয়। যার নাম দেওয়া হয় ব্রজবুলি।... প্রকৃতপক্ষে ব্রজবুলিতে কেউ কোনো দিন কথা বলেনি।... জনসাধারণ যে ভাষায় কথা বলত তা পশ্চিমা হিন্দির শাখা বিশেষ, তাকে 'ব্রজাভাখা' (ব্রজাভাষা) বলে।'

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি

বিদ্যাপতি শুধুমাত্র যে পদ রচনা করেছিলেন এমনটা নয়; এ ছাড়াও আরও বেশ কিছু গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন—তাঁর রচিত আরও অন্যান্য গ্রন্থগুলি হল—'কীর্তিলতা', মিথিলা রাজ কীর্তি সিংহ (১৪০২-১৪০৪)-র সময় রচিত বলে অনুমান করা হয়। 'ভূপরিক্রমা' (১৪০০ খ্রি.) 'পুরুষ-পরীক্ষা', (১৪১০) 'কীর্তি পতাকা' (১৪১০), 'লিখনাবলী' (১৪৩০-৪০) এর মধ্যে। শৈশব সর্বস্বহার', 'গঙ্গাবাক্যাবলী', 'বিভাগসার', 'দানবাক্যাবলী', দুর্গা ভক্তিতরঙ্গিণী'। ১৪৪০-৬০ খ্রি. এর মধ্যে রচিত বলে অনুমান করা হয়। এইরকম আন্দাজ করা হয় এরপরেও বেশ কিছুকাল তিনি বেঁচে ছিলেন কিন্তু ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দের পরে তাঁর আর কোন গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। যিনি বাংলা ভাষা জানতেন না। বাংলা ভাষায় একটি পদও রচনা করেননি। অথচ কি আশ্চর্য বাঙালির হৃদয় সর্বস্ব হয়ে বেঁচে আছেন, তিনি রাজসভার কবি। মিথিলারাজ শিব সিংহের রাজসভার কবি ছিলেন।

বিদ্যাপতি যে 'অভিনব জয়দেব' তাঁর অন্যতম কারণ পদ রচনায় ভাব সৃষ্টিতে তিনি কবি জয়দেবের অনুসারী। বিদ্যাপতি তাঁর পদে নায়িকা রাধার মনস্তত্ত্ব ও আচরণ নির্মাণের দ্বারা দেহের কামনা, বাসনা মনের চঞ্চলতা সবটা ফুটিয়ে তুলেছেন। বয়ঃসন্ধির পদে বালিকা মনের যে কৌতূহল তার যে চিত্রকল্প, তেমনই পূর্বরাগের পদে রাধার বিরহে বিবস মনের চিত্রও অপূর্ব। উন্মত্তযৌবনা রাধা এখানে সকল যুবতীর প্রতীকী হয়ে উঠেছে—মাথুর পর্যায়ের পদে সে চিত্রই ফুটে উঠেছে—

'এ সখি হামারি দুখের নারি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দর মোর।।'

পদটিতে লক্ষণীয় যে রাধা তার সখিকে বলছে এই বর্ষাময় ভাদ্রমাসে আমার প্রিয় প্রবাসে। হৃদয় শূন্য করে

চলে গেছে প্রাণপ্রিয়। বিদ্যাপতি বিরহের আর্তি নির্মাণ করেছেন দেহে কামকে জাগ্রত রেখে। কাম ও প্রেম পরিপূরক বিদ্যাপতির পদে তারই সাবলীল প্রকাশ লক্ষ করা যায়। চৈতন্য-পূর্বকালে বিদ্যপতির এ হেন পদ রচনা-বাঙালিকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করে। আর কোনও অবাঙালি কবি, বাঙালি মনে বিদ্যাপতির মতো দাগ কাটতে পারেনি। তাঁর 'ভাবোল্লাস ও মিলন'-এর পদে মনস্তত্ত্বের সেই গূঢ় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত—

'আজু রজনী হাম ভাগে পোহাইলুঁ
পেখলুঁ পিয়া-মুখ চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা।।'

পদাবলিতে 'ভাবোল্লাস ও মিলন' পর্যায় একটি কল্পিত রূপ। যেখানে মনে করা হয় কৃষ্ণ মথুরা থেকে ফিরে এসেছে। তাতে রাধার আনন্দের শেষ নেই। রাধাকৃষ্ণের মিলন লক্ষ করলে দেখা যাবে এই আবেদনের সঙ্গে বাস্তব নর-নারীর কোন বিভেদ নেই। কিম্বা বৈষ্ণব দর্শনের সঙ্গে কোন সাযুজ্য নেই। কারণ সেই দর্শন আরও পরবর্তীকালের ঘটনা। এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পদটিতে 'জীবন-যৌবন সফল করে মানার মধ্য দিয়ে এক মানবীয় আবেদন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাশাপাশি বিদ্যাপতি তাঁর পদ রচনায় শব্দ, ঝঙ্কার ও ছন্দের মিশেলে চিরন্তন জৈবনিক আচরণকে কাব্যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

৭.৫ চণ্ডীদাস

চণ্ডীদাস

পদাবলি সাহিত্যের আর এক গুরুত্ব পূর্ণ নাম—কবি চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাস সমস্যা নিয়ে (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য অংশে আলোচনা করা হয়েছে)। চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ব কবি, ফলে তাঁর পদে চৈতন্য ভক্তির কথা থাকবে না। কিন্তু পদ মাধুর্য এমন পর্যায়ের যে বাঙালি হৃদয়কে তিনি মোহিত করে দিয়েছিলেন। পদাবলির বিভিন্ন পদের ছত্রে ছত্রে তার নিদর্শন আমরা লক্ষ করি। আবেগ তাড়িত বাঙালির মনে, মানব রসের সঞ্চার ঘটিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন প্রাণের কবি। পূর্বরাগের একটি পদে সেই অসামান্য চিতার ধরা পড়েছে—

'রাধার কী হইল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা।।'

অন্তরের গভীর কথা যা সখীর সঙ্গে বিনিময় করেও সাধ মেটে না। চিরকালের এই হৃদয় ব্যথা অ-প্রতিরোধ্যভাবে আচরণের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে। অন্তরের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসা ছবি অঙ্কনে তিনি অসম্ভব পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। বৈষ্ণব পদাবলির বিভিন্ন পর্যায়ের পদ রচনা করলেও পূর্বরাগ ও অনুরাগ, বিরহ, আক্ষেপানুরাগ-এর পদে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ করে পূর্বরাগ ও অনুরাগের একটি পদে প্রেমিক-প্রেমিকার আবহমানকালের হৃদয় ধ্বনি তাঁর পদে সমূলে প্রস্ফুটিত—

'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।।'

এই পদের মর্মকথা বাস্তব জীবনের প্রাত্যহিকতা, সামাজিকতার বাইরে ইন্দ্রিয়ানুভূতির ইশারা শরীরকে বিবশ

করে দেয়। চণ্ডীদাস মরমী কবি। গভীর অনুভূতি তাঁর পদে সহজ ভাবে প্রকাশিত এক শিল্পিত প্রকাশ। যদিও এই শিল্প যতটা না শিল্পের জন্য তার চাইতে অনেক বেশি ভাবের জন্য। চণ্ডীদাসের পদে পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ হৃদয়ের সহজ স্বাভাবিক আততির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সমগ্র মানব জীবনের আকুতি পদাবলির বিভিন্ন পর্যায় ভেদে স্বতন্ত্র চিহ্নিত হয়ে ব্যালাডের লক্ষণ নিয়ে আমাদের কাছে পরিলক্ষিত হয়।

একক : ৮ জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস

৮.১ জ্ঞানদাস

বৈষ্ণব পদাবলীতে যে চারজন পদকর্তার নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হয় তার মধ্যে অন্যতম জ্ঞানদাস। কবি সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে—'চৈতন্য পার্ষদ নিত্যানন্দের ভক্তদের তালিকায় তাঁর নাম আছে। তিনি নিত্যানন্দের কনিষ্ঠা পত্নী ও বৈষ্ণব সমাজের নেতৃস্থানীয় জাহ্নবাদেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। কাটোয়ার দশ মাইল পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশের তাঁর জন্ম হয়? খেতুরীতে অনুষ্ঠিত বৈষ্ণব সম্মেলনে তিনিও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে এর অতিরিক্ত আর কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না। কেউ কেউ মনে করেন, তিনি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন...। অন্যান্য পদকর্তার মতোই জ্ঞানদাসকে নিয়েও কিছু সমস্যা আছে কিন্তু মোটের উপর তা বড়োই লঘু সমস্যা। "...'জ্ঞানদাস' (ও জ্ঞান) ভনিতা অনেক পদ মিলিয়াছে। জ্ঞানদাস নাম তখন এবং পরেও অনেকের নিশ্চয়ই ছিল। এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ না কেহ পদ রচনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এ নামে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিকে ধরা যাইতেছে না এবং পদগুলির মধ্যে দ্বিতীয় লেখনীর নিশ্চিত পরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং আপাতত জ্ঞানদাস-নামিত সমস্ত পদই একজনের উপর চাপাইতে হয়।'

জ্ঞানদাসের কবিতায় চণ্ডীদাসের আদর্শে রাধার এক গ্রাম্য বধূর মূর্তি ধরা পড়েছে। কবি হিসেবে তিনি অনেক বেশি চণ্ডীদাসের অনুসারী। তাঁর রচিত পদে বিরহের উত্তাপ ঝরে পড়ে। প্রেমের অপূরণীয় বেদবানী রচনায় তিনি আক্ষেপে জর্জরিত। বাঙালি জীবনে নর-নারীর এই আক্ষেপ অনেক সময় আমরা চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গে জ্ঞানদাসের পদের পার্থক্য খুঁজে পাই না। কিন্তু জ্ঞানদাস, কবি চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য। সমালোচকরা এমন কথাও বলেছেন বিভিন্ন স্থানে। চণ্ডীদাসের পদ জ্ঞানদাসের পদ বলে প্রচলিত হয়ে গেছে তাতে কিছু করা যায় না। জ্ঞানদাসের কাব্যের ভাব বিহ্বলতা, ছন্দ মাধুর্য পদাবলি সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। 'পদাবলীর কবি বলিয়া জ্ঞানদাসের খ্যাতি চণ্ডীদাসের পরেই একইভাবের পদ দুই নামে পাওয়া গিয়েছে কৃতিত্ব কাহার তাহা লইয়া বিবাদ'। যদিও এই মতান্তর চণ্ডীদাস সমস্যার মতো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়নি। জ্ঞানদাসকে বাঙালিমন সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছেন তাঁর পদের হৃদয় কাড়া টানে—

'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।।'

পূর্ববর্তী পদকর্তাগণ রাধার যে ছবি অঙ্কন করেছেন তার সঙ্গে এখানে কিছু পার্থক্য আছে। জ্ঞানদাসই প্রথম আমাদের শোনালেন প্রেমিকার জন্য, প্রেমিকের প্রতিটি অঙ্গ কেঁদে ওঠে। কামজর্জর নারী মনের এমন চিত্র

আর কোনো পদকর্তা রচনা করতে পারেননি। কবির কৃতিত্ব এখানেই যে তিনি নারী মনের এই সামগ্রিক আকুলতাকে বাক্যবন্ধে তুলে ধরতে পেরেছেন। তাঁর অন্য একটি পদে দেখতে পাই—

'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।'

মরীচিকাময় জীবন প্রপঞ্চ, এক মায়ার জগৎ। আমরা যা চাই তা পাই না। জ্ঞানদাস জীবনযুদ্ধে সর্বদা পরাজয় গুজরানে প্রস্তুত। তিনি সুখে থেকেও দুঃখী। অর্থাৎ সুখের সময় ভাবেন পরেই তো দুঃখের হাতছানি সর্বতোভাবে আয়ন করে নেবে। জ্ঞানদাসের এই দর্শন সমগ্র মানব জাতির কাছে এক বড়ো প্রশ্ন হল সে তার আকাঙ্ক্ষার কাছে সবই নেতিবাচক।

বৈষ্ণব পদাবলিতে চৈতন্য-পূর্ব এবং পরবর্তী দুটো বিভাজন আছে। দুটোর মধ্যে পার্থক্যও আছে। সে পার্থক্য মূলত ভক্তিভাবের। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন মেনে ভগবান জ্ঞান করে তাকে ভজনা করা হয়েছে। যদিও চৈতন্যের সমকালেই তাঁকে কেন্দ্র করে একপ্রকার জোয়ার এসেছিল। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা তত্ত্বজ্ঞানে চৈতন্যদেবকে অবতার ধরে নিয়ে গোস্বামীরা মনে করেন—ভগবান লীলার জন্য জীব সৃষ্টি করেছেন। চৈতন্যদেব সচ্চিদানন্দ। তার লীলায় রাধা হল প্রধান হ্লাদিনী শক্তি। ভক্তগণ রাধা ও কৃষ্ণকে দুই সত্তা মনে করে না। 'ন সো রমণ না হাম রমণী' দুই অর্ধ সত্তা মিলে এক শক্তি। কিন্তু এর বাইরে পার্থিব জীবনে কবিরা নর-নারীরা সুখ, দুঃখ অনুভূতির কথা নির্মাণ করেছেন। বাংলার কাব্য পদাবলি দীর্ঘকাল ধরে আমাদেরকে অমায়িক ভাবে মোহিত করে রেখেছে তার মরমী আকর্ষণের জন্য।

৮.২ গোবিন্দদাস

গোবিন্দদাসের পরিচয় যেটুকু পাওয়া যায়—'পিতার নাম চিরঞ্জীব, মাতার নাম সুনন্দা। মাতামহ দামোদর সেন শ্রীখণ্ডের একজন প্রধান পণ্ডিত, ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় দুই ভাই শ্রীখণ্ডে মাতামহাবাসে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। পৈতৃক নিবাস কুমারনগরে এবং আরো পরে তেলিয়া বুধুরি গ্রামে গিয়ে বসবাস করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকর ইত্যাদি পরবর্তীকালের জীবনীগ্রন্থ অনুসারে মাতামহ শক্তির উপাসক ছিলেন বলিয়া রামচন্দ্র ও গোবিন্দ প্রথম জীবনে শক্তি-উপাসক ছিলেন। বেশি বয়সে শ্রীনিবাস আচার্যর নজরে আসিয়া ও তাঁহার প্রভাবে পড়িয়া দুই ভাইই সপরিবারে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোবিন্দের প্রত্নীর নাম মহামায়া, পুত্রের নাম দিব্যসিংহ।' গোবিন্দদাসের দাদা রামচন্দ্র 'কবিরাজ'ও পদকর্তা ছিলেন। তবে গোবিন্দদাসের মতো উৎকৃষ্ট মানের পদ তিনি রচনা করেননি। এবং খুব বেশি রচনাও তাঁর নেই। কিন্তু তিনিও গোস্বামীদের সংস্পর্শে ছিলেন। এ ছাড়া গোবিন্দদাস বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীদের বিশেষ সুহৃদ হওয়ায় তাঁর পদগুলি সমকালেই গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছিল। 'শ্রীনিবাস আচার্য গোবিন্দের রচনা বৃন্দাবনে জীব গোস্বামীর কাছে পাঠাইয়া দিতেন। (কবির সঙ্গে জীব গোস্বামীর পত্র ব্যবহার ছিল।) সে পদাবলী পড়িয়া ও শুনিয়া জীব প্রমুখ বৃন্দাবনের গোস্বামীরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। সেই প্রীতির চিহ্ন হিসেবে জীব গোস্বামী কবীন্দ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন।... গোবিন্দদাস বৈদ্য বলিয়া কবিরাজ ছিলেন না। কবিশ্রেষ্ঠ গণ্য হয়েছিলেন বলিয়াই তিনি 'কবিরাজ'।

গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য। 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি'। কিন্তু গোবিন্দদাস নিজকীয়তায় উজ্জ্বল। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের অনেক পদই ভনিতার গণ্ডগোল পর্যবসিত। এ প্রসঙ্গে গবেষকদের মধ্যেও নানা বিতর্ক রয়েছে। গোবিন্দদাসের 'আটটি পদে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাসের যুগ্ম ভনিতা আছে এগুলি সম্বন্ধে রাধামোহন ঠাকুর তার পদামৃতসমুদ্র টীকায় বলিয়াছেন যে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির অসম্পূর্ণ পদ সম্পূর্ণ করিয়া নিজের ভণিতায় যোগ করিয়াছিলেন।' একটি বিশেষ পদ সম্পর্কে—'গোবিন্দদাস স্বীকার করেছেন যে বিদ্যাপতি রচনা পড়িয়া লেখা।' অগ্রজদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় এমনটা আর কোনো বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে লক্ষ করা যায় না। 'গোবিন্দদাস তিন পূর্ববর্তী কবির উদ্দেশ্যে চারটি বন্দনা পদ লিখিয়াছিলেন—জয়দেবের উদ্দেশ্যে একটি, চণ্ডীদাসের উদ্দেশ্যে একটি, বিদ্যাপতির উদ্দেশে ২টি।' গোবিন্দদাসের পদ নিয়ে নানারকম বিতর্ক আছে গোবিন্দদাস ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যর শিষ্য। 'শ্রীনিবাস আচার্য আর একজন শিষ্য ছিলেন গোবিন্দদাস আচার্য। তিনিও পদ রচনা করতেন এবং এই গোবিন্দদাস আচার্য পদ রচনায় গোবিন্দদাসের সামনে পারদর্শী ছিলেন 'অষ্টকালীয় লীলাবর্ণনা' বা 'একান্নপদ' নামক পুঁথি আসলে কোন গোবিন্দদাসের রচনা এ নিয়ে বিতর্ক আছে।

গোবিন্দ দাস চৈতন্য-পরবর্তী কবি। ফলে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন মেনে কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মঞ্জরীভাবের সাধক। রাধার সখী স্বরূপ। সে দিক থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন মেনে তিনিই একমাত্র কবি যিনি ভনিতা প্রয়োগের অধিকারী। যেহেতু তিনি বিদ্যাপতির সঙ্গে তুলনীয় তাই সে দিক থেকে বিচার করলে—ভক্তিভাবে বিদ্যাপতির চাইতে অধিক পরিমাণে সচেতন। বিদ্যাপতি যেহেতু চৈতন্য-পূর্ব কবি সে কারণে তাঁর পদে চৈতন্য ভক্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু কাব্য ভাষা, ছন্দ এবং অলঙ্কার প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহস্ত। পদাবলীর বিভিন্ন পদের মধ্যে গৌরাঙ্গ বিষয়ক ও গৌরচন্দ্রিকার পদ রচনায় তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সেখানে তিনি গৌরাঙ্গের দেহে রাধাভাব দ্যুতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন—'নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে/ পুলক-মুকুল-অবলম্ব'। কিন্তু অভিসারের পদে তিনি 'রাজাধিরাজ'। একটি পদে রাধার অভিসার যাত্রার যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। তা শুধু মাত্র কৃষ্ণপ্রেমে ভাবিত রাধার পরিচয় নয়। একই সঙ্গে সকল যুবতীর প্রেমিকের নিমিত্তে অভিসারের কথা—

'কন্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চিরহি ঝাঁপি।।
গাগরী বারি ঢারি করি পিছল
চল তহি অঙ্গুলি চাপি।।'

দয়িতার সঙ্গে দয়িতের মিলনের জন্য এই যে চুরিবিদ্যা, ফাঁকি দিয়ে প্রেমাস্পদের কাছে পৌঁছনোর শরীর মনের টান; গোবিন্দদাস তাঁর বহু পদে এই সুর ঝঙ্কার তুলেছেন। আবার অন্য একটি পদে লক্ষ করা যায় সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে রাধা চলেছে প্রিয়ার সঙ্গে মিলিত হতে। পার্থিব কোন প্রতিবন্ধকতা সেখানে দেওয়াল হয়ে উঠতে পারেনি—

'মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলয়িত শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।।
তহিঁ অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারিই নীল নিচল।।'

পদকর্তা গোবিন্দদাস বৈষ্ণবীয় আখরে ভগবানের প্রতি ভক্তের টানের আড়ালে আসলে যে মানবীয়

জীবনেরই আখ্যান রচনা করেছেন এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। যা প্রাণ ধর্মের প্রকৃতি স্বরূপ।

৮.৩ সংক্ষিপ্তসার

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনের পাশাপাশি বৈষ্ণব কবিরাও পদরচনা করেছেন। এদের পদাবলি রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনি অবলম্বনে লেখা। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি তাঁর জীবনকালেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। স্মার্তপণ্ডিত কবি বিদ্যাপতি ব্রজবলি ভাষায় রসসমৃদ্ধ পদ রচনা করে কীভাবে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন তার পরিচয়, কবির নানা সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত তথ্য, কবির ভাব-বৈশিষ্ট্য এই আলোচনায় প্রকাশ পেয়েছে। কবি চণ্ডীদাস পদাবলি সাহিত্যের আরেক গুরুত্বপূর্ণ নাম। তাঁর পদমাধুর্য বাঙালি হৃদয়কে মোহিত করেছে। পূর্বরাগের অসামান্য পদ রচনা করে তিনি বাঙালির প্রাণের কবি হয়ে উঠেছিলেন। সহজসুরের মরমীয়া কবি তিনি। তাঁর রচনায় সূক্ষ্ম মিষ্টিক অনুভূতির ছোঁয়া আছে। চৈতন্যোত্তর যুগের প্রথম শ্রেণীর কবি জ্ঞানদাস ব্রজবুলি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছেন। তিনি চণ্ডীদাসের অনুসারী। জ্ঞানদাসের কাব্যের ভাব বিহ্বলতা, ছন্দ মাধুর্য পদাবলি সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। বাংলা সাহিত্যের 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' 'কবিরাজ' গোবিন্দদাস। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন মেনে তিনি পদ রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর কবিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁর রচিত অভিসার পর্যায়ের পদগুলি। গোবিন্দদাস মূলত চিত্ররসের কবি। ছন্দের ঝঙ্কারে, অলংকারের ব্যবহারে, শব্দ প্রয়োগের লালিত্যে তাঁর তুলনা নেই। তাঁর রচনায় প্রাণধর্মের প্রকৃতি লক্ষ করা যায়।

৮.৪ অনুশীলনী

বিস্তৃত বিশ্লেষণাত্মক উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন—

১। পদাবলি বলতে আমরা কী বুঝি সে বিষয়ে আলোকপাত করুন।
২। বিদ্যাপতির কবি কৃতিত্বের পরিচয় দিন।
৩। চণ্ডীদাসের পদাবলির গুরুত্ব বিচার করুন।
৪। পদাবলি সাহিত্যে গোবিন্দ দাসের স্বাতন্ত্র্য বিচার করুন।
৫। পদ নির্মাণে জ্ঞানদাস অন্য পদকর্তাদের থেকে ভিন্ন কোথায় আলোচনা করুন।
৬। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের কাব্যসৃষ্টির তারতম্য বিচার করুন।
৭। চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের পদের সম্পর্ক ও পার্থক্য বিচার করুন।
৮। চৈতন্য-পূর্ব ও চৈতন্য-উত্তর পদাবলির পার্থক্য বিচার করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন:

১। পদাবলির সাধারণ রূপ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২। বিদ্যাপতি রচিত গ্রন্থগুলি উল্লেখ করুন।
৩। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাঙালি জীবনে কী প্রভাব সৃষ্টি করেছিল তা লিখুন।
৪। গোবিন্দদাসকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলার কারণ লিখুন।
৫। ব্রজবুলি ভাষার পরিচয় দিন।

সহায়ক গ্রন্থ

১। সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*
২। শ্রীভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*
৩। সুখময় মুখোপাধ্যায়, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম*
৪। গোপাল হালদার, *বাংলা সাহিত্যের রূপ-রেখা*
৫। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*
৬। ক্ষেত্র গুপ্ত, *বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস।*

নোটস্

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

মডিউল : ৩

অন্ত্য-মধ্যযুগ-১

একক ৯-১১ ❐ চৈতন্য-চরিতসাহিত্য : চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত

গঠন

৯-১১.১ উদ্দেশ্য

৯.২ প্রস্তাবনা

৯.৩ চৈতন্য জীবনী

৯.৪ চৈতন্য প্রভাব

৯.৫ চৈতন্য চরিতকাব্য

১০.১ বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত

১০.২ লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' ও জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'

১১.১ কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত

১১.২ চৈতন্যজীবনী ও জীবনীগ্রন্থ বিশ্লেষণ

১১.৩ সংক্ষিপ্তসার

৯-১১.১ উদ্দেশ্য

খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর চারশত বছরের সৃষ্ট সাহিত্যের অংশ এই মডিউলের বিষয়। এই দীর্ঘ সময়ের শুধু সাহিত্য নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় এই সময়ে রচিত সাহিত্যে বিধৃত। এই মডিউল পাঠ করলে এ বিষয়ে অবহিত হওয়া যাবে।

হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম ও আরও ছোটখাটো ধর্মসম্প্রদায়ের মিলন মিশ্রণে যে প্রতিফলন তার কথা এখান থেকে জানা যাবে।

অনার্য, ব্রাহ্মণ্য, নিম্নবর্গের হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সংশ্লেষে গড়ে ওঠা নতুন নতুন দেবদেবীর আবির্ভাব ও তাঁর উচ্চ সম্প্রদায়ে গৃহীত হওয়ার বিষয়টিও এখান থেকে জানা যাবে।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব কালের সমাজের অবস্থা, যুগাবতার হিসাবে চৈতন্যদেবকে গ্রহণ করার অনিবার্যতা সম্পর্কেও জানা যাবে।

শ্রীচৈতন্যের অসমান্য জীবনকথা, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে সমাজে তাঁর প্রভাবের পরিচয়ও পাওয়া যাবে।

বাংলা সাহিত্যের এক নতুন শাখা জীবনচরিত-সাহিত্যের সৃষ্টি ও বিকাশ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে।

লোকসমাজে প্রচলিত ব্রত কথা, পাঁচালি ইত্যাদি কাব্যে উত্তরণ সম্পর্কিত ইতিহাস বোঝা যাবে।

নতুন ধর্মবোধ, নতুন জীবনচর্যা ও মানবত্বের ক্রম উত্থানের ইতিহাস এই অংশ থেকে জানা যায়।

চরিত-সাহিত্যের কবিদের সম্পর্কে জানানো এই অংশের উদ্দেশ্য।

৯.২ প্রস্তাবনা

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বাংলার ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটি অসামান্য ঘটনা। মধ্যযুগের কবি বলেছেন,

'যদি গৌর নহিত কিমেনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে।'

আধুনিক যুগের কবি বলেছেন,

বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই
ধরেছে কায়া।'

অর্থহীন, সংস্কারে আবদ্ধ বাঙালি-জীবন চৈতন্য-আবির্ভাবের ফলে বাঁচবার নতুন প্রেরণা পেল এবং এই প্লাবন শুধু বাংলায় সীমাবদ্ধ রইল না, উড়িষ্যা, উত্তর ভারত, আসামকেও আন্দোলিত করল। এ ব্যাপারটিকে অনেকেই চৈতন্য-রেনেশাঁস বলে অভিহিত করতে চান। যে অলৌকিক জীবন মানবদেহে অতিমানবতার প্রকাশ ঘটিয়েছে তার জীবন ও চারিত্র্য সম্পর্কে একটি ন্যূনতম ধারণা না থাকলে শুধু সংক্ষিপ্ত জীবনীসাহিত্য পাঠে তা আংশিক হতে বাধ্য। বিশ্বম্ভর বা নিমাই বা গৌরাঙ্গ কেমন করে বাল্য-কৈশোরের চাঞ্চল্য কাটিয়ে নবদ্বীপের ধর্ম ও সমাজজীবনের কেন্দ্রভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং কৃষ্ণের অবতার হিসাবে চিহ্নিত হলেন তার ইতিহাস তাঁর জীবনের মধ্যেই আছে। শ্রীচৈতন্য যুগাবতার হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন তাঁর নবদ্বীপ বাসকালেই। অধর্মের বিনাশ ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা বিষ্ণুর অবতারগ্রহণের কারণ। চৈতন্য-আবির্ভাবের সমকালীন বাংলা বিশেষত নবদ্বীপের সমাজ ছিল অত্যন্ত কলুষিত—

'বিষয় সুখেতে সব মজিল সংসার।' (চৈতন্য ভাগবত)

ধর্মকর্মের অধিকার ধনীরা কুক্ষিগত করেছিল। তারা ধর্মের নামে প্রভূত খরচ করত এবং উৎকট আনন্দে মেতে উঠত। সাধারণ মানুষ ছিল নিরন্ন এবং অত্যাচারিত। এই সমাজ-পরিবেশে লোক উদ্ধারের জন্য জন্ম নিলেন শ্রীচৈতন্য। তাঁকে কৃষ্ণের অবতার বলে উদ্ধব শ্রীবাস, গদাধর, মুকুন্দ প্রমুখ কৃষ্ণভক্তেরা মান্যতা দিলেন। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে স্পষ্ট হল যে, ধর্মসংস্থাপন তাঁর কাজ ছিল কিন্তু তা গৌণ কাজ। নিজের লীলা আস্বাদনের জন্যই তিনি অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বৃন্দাবনলীলা ও নবদ্বীপলীলা ভিন্ন নয়। তারা পরস্পরের পরিপূরক। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে, তাঁর আকর্ষণে বহু মানুষের সমবেত হওয়া, তাঁকে ঘিরে যে উচ্ছ্বাস, যে ভক্তি ব্যাকুলতা তার উৎস লুকিয়ে আছে তাঁর জীবনে। তাই তাঁর জীবনী অবশ্য পাঠ্য।

৯.৩ চৈতন্য জীবনী

চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটেছিল ১৪০৭ (১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দ) শকাব্দের ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায়। সেদিন চন্দ্রগ্রহণ ছিল। এবং তাঁর তিরোভাব ১৪৫৫ শকাব্দ (১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ) আষাঢ় মাসে। চৈতন্যের পিতা ছিলেন জগন্নাথ মিশ্র (ইনি পুরন্দর মিশ্র নামেও খ্যাত) এবং মাতা শচীদেবী। আদিতে এঁরা শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন পরে নবদ্বীপে আসেন। এরও আগে তাঁদের পূর্বপুরুষ উড়িষ্যার যাজপুরের অধিবাসী ছিলেন বলে কথিত আছে।

চৈতন্যের নামকরণ করা হয় বিশ্বম্ভর কিন্তু বিশ্বম্ভরের জন্মের পূর্বে শচীদেবীর পরপর কয়েকটি সন্তান মারা গিয়েছিল বলে অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতাদেবী এই সন্তানের নাম রাখেন নিমাই। অত্যন্ত গৌর গাত্রবর্ণের কারণে ইনি বাল্যকাল থেকেই গৌরাঙ্গ বা গোরা নামে পরিচিত ছিলেন। বাল্যকালে নিমাই অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে তার বিস্তৃত বর্ণনা আছে এবং সেই সঙ্গে কিছু অলৌকিক ঘটনার

বর্ণনাও আছে। বিশ্বম্ভরের বড়ভাই বিশ্বরূপ নিমাই-এর বাল্যকাল সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করেন। এজন্য বাল্যকালে নিমাইকে পড়াশুনা করতে পাঠানো হয়নি কিন্তু নিমাই-এর জেদে তাঁর পিতা তাঁকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ভর্তি করতে বাধ্য হন। অতি অল্প সময়ে নিমাই ব্যাকরণ, স্মৃতিশাস্ত্র ইত্যাদিতে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তর্কশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য এবং খ্যাতি বহুদূর ছড়িয়ে পড়ে। এবার তিনি নিজে টোল খুলে ছাত্র পড়াতে শুরু করেন (১৫০৫ খ্রিস্টাব্দ)।

ইতিমধ্যে তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্র মারা যান এবং তিনি নিজেদেরই মত দরিদ্রের কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেন—মাত্র পাঁচটি হরীতকী দিয়ে এই বিবাহ হয় (১৫০১-১৫০২ খ্রিস্টাব্দ)। ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে চৈতন্য বর্তমান বাংলাদেশের শ্রীহট্টে গমন করেন। উদ্দেশ্য, অর্থসংগ্রহ ও সেখানকার যজমানদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন। এখানে তপন মিশ্র নামে এক কৃষ্ণভক্তকে তিনি প্রথম ধর্মোপদেশ দেন এবং ইনিই চৈতন্যের প্রথম শিষ্য। এখানেও তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রভূত খ্যাতি হয়। পূর্ববঙ্গে থাকাকালীনই তিনি প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবীর দর্পদংশনে মৃত্যুর সংবাদ পান। দেশে ফিরে প্রথমে শোকে অভিভূত হলেও কিছুদিনের মধ্যেই অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। পরের বছরই মাতার নির্বন্ধে তিনি রাজপণ্ডিত সনাতনের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। কিন্তু সংসারে তাঁর মন ফিরল না।

১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি পিতার পিণ্ডদানের উদ্দেশ্যে গয়া গমন করেন এবং ১৫০৮-এর ডিসেম্বর মাস নাগাদ প্রত্যাবর্তন করেন। গয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনে তিনি ভাববিহ্বল হয়ে পড়েন। যে গৌরাঙ্গ গয়ায় গিয়েছিলেন এবং যিনি গয়া থেকে ফিরে এলেন তার মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। কিছুদিন চেষ্টা করার পর তিনি অধ্যয়ন-অধ্যাপনা পুরোপুরি ত্যাগ করলেন। শ্রীবাসের গৃহে নিত্যই নৃত্য-কীর্তনে যোগ দিতে লাগলেন। ক্রমে অদ্বৈত, শ্রীবাস, মুকুন্দ ও পরে সনাতন হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে নবদ্বীপের পথে পথে কীর্তন করে ফিরতে লাগলেন। এই সময়েই বিশেষ ঘটনা কাজী-দলন ও জগাই-মাধাই উদ্ধার। এই সময় তাঁর দেহে নানারকম ভাববিকার দেখা যেতে লাগল। লোকের ধারণা হল তাঁর বায়ুরোগ হয়েছে। শ্রীবাস শচীদেবীকে বোঝালেন যে, এ কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ।

এরপর চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে উঠল। গৃহজীবন যাপন করবেন এবং ধর্মপ্রচার করবেন এমন ব্যাপার লোকে মান্য করে না। বাহ্য সন্ন্যাস গ্রহণের প্রয়োজন না থাকলেও নানা দিক বিবেচনা করে তিনি ১৫১০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি (১৪৩১ শকাব্দ) গৃহত্যাগ করলেন এবং কাটোয়ায় গিয়ে কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা অনুযায়ী চৈতন্য শচীমাতাকে বিষয়টি আগেই জানিয়েছিলেন। এবং মায়ের সব দায়িত্ব সারা জীবন নেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের বারো দিন পর শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে মাতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। দ্বাদশ দিন উপবাসী মাতার কাছে তিনি অন্নভিক্ষা গ্রহণ করেন। কয়েকদিন অদ্বৈত আচার্যের গৃহে অবস্থান করে তিনি পুরী বা নীলাচলে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য যাত্রা করলেন। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ ছিল যে, পুরীতে রথযাত্রার সময় প্রত্যেক বছর নবদ্বীপের ভক্তেরা আসতেন, তাদের মাধ্যমে নবদ্বীপের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

পুরীতে পৌঁছানোর পর তিনি বাসুদেব সার্বভৌমের গৃহে আশ্রয় লাভ করেন এবং এই বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীকে কয়েকদিনের মধ্যেই (১২ দিন) স্বমতে অর্থাৎ ভক্তিধর্মে আনয়ন করেন। পরে, রাজা প্রতাপ রুদ্রের গুরু কাশী মিশ্রকেও তিনি রাগভক্তিতে বিশ্বাসী করে তোলেন। ফলে রাজা প্রতাপ রুদ্র ও রাজপরিবার তাঁর অনুগত হয়ে ওঠে।

১৫১০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে (১৪৩২ শকাব্দ) বৈশাখের প্রথমে চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বার হন। সন্ন্যাসীদের এক স্থানে থাকতে নেই এটি একটি কারণ, দুই, দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত তীর্থস্থানগুলি পরিক্রমা এবং কেউ কেউ বলেন তাঁর নিরুদ্দিষ্ট বড়ভাই বিশ্বরূপ দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করছেন, এমন সংবাদ তাঁর কাছে ছিল। ভ্রাতার সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন কিন্তু ভ্রাতা তখন জীবিত ছিলেন না। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে সবচেয়ে উল্লেখ্য ঘটনা রায় রামানন্দের গোদবরীতীরস্থ বাড়িতে তাঁর সঙ্গে মিলন ও পরস্পরের ভাব বিনিময়। সার্বভৌম

ভট্টাচার্যই তাঁকে দাক্ষিণাত্যে রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হতে বলেছিলেন। রায় রামানন্দই প্রথম তাঁকে রাধাকৃষ্ণের যুগলবিগ্রহ হিসাবে চিহ্নিত করেন। চৈতন্য পরে তাঁকে নীলাচলে আসতে বলেন এবং রায় রামানন্দ তাঁর উচ্চ রাজকর্মচারীর পদ ছেড়ে নীলাচলে চলে আসেন। শ্রীরঙ্গমে তাঁর সঙ্গে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য পরমানন্দ পুরীর সাক্ষাৎ হয়। ১৫১২ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে তিনি একবার নীলাচলে ফেরেন, আবার রথের পর দাক্ষিণাত্য গিয়ে গোদাবরী তীর থেকে শীতকালে রায় রামানন্দকে সঙ্গে নিয়ে নীলাচলে ফিরে আসেন।

১৬১৪ খ্রিস্টাব্দে চৈতন্য নীলাচল থেকে বাংলা ঘুরে বৃন্দাবন যাওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন কিন্তু খুব বেশি লোকসংঘট্ট হওয়ায় গৌড় থেকে ফিরে আসেন। এই সময়ে তাঁর সঙ্গে হুসেন শাহের রাজকর্মচারী রূপ (দবির খাস) ও সনাতন (সাকর মল্লিক)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি পরে তাদের তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। তিনি রামকেলি পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসেন এবং সম্ভবত শান্তিপুরে শচীমাতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে শরৎকালে মাত্র দুজন অনুচর সঙ্গ নিয়ে চৈতন্যদেব ঝারিখণ্ডের পথে বনের মধ্য দিয়ে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। প্রথমে তিনি কাশীতে যান সেখানে তপন মিশ্র (তাঁর প্রথম শিষ্য), বৈদ্য চন্দ্রশেখর ও কীর্তনীয়া পরমানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এই সময় কাশীতে প্রকাশানন্দের মনে তিনি ভক্তিভাব সঞ্চার করেন। এরপর তিনি প্রয়াগে যান ও সেখান থেকে মথুরা ও বৃন্দাবনে যান। এইসব অঞ্চলের লুপ্ত তীর্থগুলি তিনি পুনরুদ্ধার করেন এবং রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে আবার প্রয়াগে ফিরে আসেন। এখানে রূপ এবং তাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভ বা অনুপম তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। এঁদের বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি কাশী যান এবং এখানে সনাতন তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। এঁকেও বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি নবদ্বীপে যান এবং শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে ভোজন করেন (১৫১৬ খ্রিস্টাব্দ)। এই তাঁর শেষ স্বদেশে আগমন এরপর মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ ১৮ বছর তিনি নীলাচলেই অবস্থান করেন।

সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর থেকে তিনি ব্রহ্মচর্যের নিয়ম কঠোরভাবে পালন করতেন। সর্বপ্রকার বিলাস বর্জন করেছিলেন, স্ত্রীমুখ পর্যন্ত দর্শন করতেন না। স্ত্রীমুখ দর্শনের জন্য তিনি ছোট হরিদাসকে বিসর্জন দিয়েছিলেন, জগদানন্দ বিলাসদ্রব্য আনয়নের জন্য তাঁর কাছে কঠোর ভর্ৎসনা লাভ করেছিলেন। রাগভক্তির সুদুর্গম পথে চলা তিনি নিজের জীবন দিয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

নীলাচলে অবস্থানের শেষ বারো বছর তিনি যে অবস্থায় ছিলেন, তার নাম দেওয়া হয়েছে দিব্যোন্মাদ অবস্থা। স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, হরিদাস, পরমানন্দপুরী ইত্যাদি ভক্তরা সব সময়ে তাঁর কাছাকাছি থাকতেন এবং তাঁকে রক্ষা করতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন,

নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা প্রলাপময় বাদ।।

কখনো চটক পর্বতকে গোবর্ধনগিরি ভ্রম করতেন, কখনো কৃষ্ণভ্রমে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে যেতেন, কখনো রথের সামনে মূর্ছা যেতেন। স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ প্রমুখ ভক্তেরা এই অবস্থার সঙ্গে রাধিকার বিরহার্তির সাযুজ্য দেখেছেন। রাগভক্তির প্রকাশ সন্ন্যাসের পূর্বে দেখা গেলেও এবং সন্ন্যাসের পূর্বে কৃষ্ণভাবে ভাবিত হলেও সন্ন্যাসের পর তিনি শুধুই রাধা। এই দিব্য ভাবাবস্থা কল্পনারও অতীত। অধিকাংশ সময় তাঁর চেতনা থাকত না। তাঁর শেষ আশ্রয় 'গম্ভীরা' নামক ঘরটির ভিত্তিতে মুখ ঘসে ঘসে দেহ ও মুখ রক্তাক্ত করে ফেলতেন—

রোমকূপে রক্তোদগম দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে। (চৈ.চ)

১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মহাপ্রভুর তিরোধান ঘটে। মৃত্যুর কাল বা ঘটনা নিয়ে চৈতন্য চরিতামৃতে কিছু বলা হয় নি। লোচনদাস ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল কাব্যে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। জয়ানন্দ বলছেন, রথের সামনে বিজয়া নাচতে নাচতে মহাপ্রভুর পায়ে ইটের আঘাত লাগে যা তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়। বিষয়টি বিতর্কিত।

ভক্তেরা এত বাস্তব মৃত্যু মানতে রাজি হননি। তাঁরা মনে করেন হয় তিনি জগন্নাথে বিলীন হয়েছেন, নয়, সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছেন, নয় পুরীর পাণ্ডারা তাঁকে হত্যা করে মৃতদেহ গোপন করে ফেলেছে। এসব অনুমানের কোনো প্রমাণ নেই।

শ্রীচৈতন্য নিজে দার্শনিক ছিলেন না। তাঁকে ঘিরে দর্শন রচিত হয়েছে। তাঁর রচনার একমাত্র পরিচয় 'শ্লোক শিক্ষাষ্টক'। বৈষ্ণবের আচরণীয় বিধি সম্পর্কে এবং ভক্তি সম্পর্কে সেখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

৯.৪ চৈতন্য প্রভাব

শ্রীচৈতন্য বাংলার সমাজজীবনে ধর্মীয় ও সংস্কৃতির জীবনে যে অসামান্য প্রভাব ফেলেছিলেন, তাতে এই পুনরুজ্জীবনকে অনেকেই বাংলাদেশে ঘটা প্রকৃত রেনেশাঁস বলতে চান। সামাজিক জীবনে ধনী, প্রথাগতভাবে বিদ্বান, প্রভাবশালী ও উচ্চবর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করার মাধ্যমেই তিনি প্রথম সমাজ বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত করেছেন। তাঁর "চণ্ডালো'পি দ্বিজশ্রেষ্ঠ: হরিভক্তিপরায়ণ:' এই বাক্য বাংলার প্রান্তীয় মানুষের কাছে ছিল মুক্তির দিশা। খোলাবেচা শ্রীধর, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, যবন হরিদাস চরম নিঃস্ব হয়েও তাঁর কাছে মান্যতা লাভ করেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর ধর্মীয় জীবন যে আচার অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছিল বৃন্দাবন দাস তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ধন এবং বিদ্যার দম্ভ। 'শুষ্ক পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধির কসরৎ' এর সাহায্যে এঁরা সাধারণ মানুষদের অবজ্ঞা করতেন ও দূরে থাকতেন। গৌরাঙ্গও তাঁর প্রথম জীবনে এদেরই অনুসরণ করতেন। 'দিগ্বিজয়ী পরাভব' যদি সত্য নাও হয়, তর্কযুদ্ধে সমব্যবসায়ীদের পরাস্ত করে গৌরাঙ্গ যে আনন্দ পেতেন, তা সম্ভব। এই বিদ্যার আড়ম্বর কৃষ্ণভক্তির কাছে যখন তুচ্ছ হয়ে গেল তখন তিনি মানবধর্মে সব মানুষকে সমান বলে মর্যাদা দিতে পারলেন। এই কারণে শাস্ত্রসম্বল ব্রাহ্মণেরা তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন ও নানাভাবে বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর অবতার হিসাবে চিহ্নিত হওয়া এদের সব গর্ব চূর্ণ করেছিল। চৈতন্যের অগ্রজতুল্য নিত্যানন্দ ভক্তির অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন শূদ্রদেরই। অদ্বৈত আচার্যও বলেছিলেন,

অদ্বৈত বলেন যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা।।

বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে চৈতন্যপ্রভাব আরও গভীর ও সুদূপ্রসারী। সাহিত্যের মধ্যে এই পরিবর্তনের পূর্ণ প্রকাশ। এর আগে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচিত হলেও সংস্কৃত রচনারই আধিপত্য ছিল। চৈতন্যপ্রভাবে বাংলা গীতিকাব্য অর্থাৎ পদাবলীর ধারা উচ্ছ্বসিত উঠল। সংস্কৃতেও কাব্যনাটক রচিত হতে লাগল। চৈতন্য নিজে যাত্রাপালায় অভিনয় করে তাকে উজ্জীবিত করলেন। চৈতন্য জীবনীসাহিত্য রচিত হতে লাগল অজস্র। ভাব ও ভাষারীতির মধ্যে এল নতুন মাধুর্য ও রুচিশীলতা। চৈতন্য প্রভাবে মঙ্গলকাব্যের ক্রোধপরায়ণ দেবদেবীও তাদের হিংস্র মনোভাবকে নরম করলেন। কীর্তন গানের প্রসারও হল কূলপ্লাবী। শতাধিক পদকর্তা তাঁদের ভাবমূলক সংগীতে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুললেন। এমনকি মুসলমান কবিরাও পদরচনা করতে লাগলেন। শুধু চৈতন্য নয় তার গণদেরও চরিতসাহিত্য রচিত হতে লাগল। মানুষ শ্রীচৈতন্যকে দেখে ধর্মে, কাব্যে জীবনে এল মানবীয়তা। কীর্তনগানের সুর, ভাব, ভাষা পরবর্তী কাব্যধারায় গভীর প্রভাব ফেলল। দৃষ্টান্ত—মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত প্রমুখ কবিরা। বাউল গান ও কীর্তন আজও বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যার মর্মমূলে আছেন চৈতন্যদেব।

৯.৫ চৈতন্য চরিতকাব্য

চরিতকাব্য ভারতীয় সাহিত্যে নতুন নয়। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', বাক্‌পতিরাজের 'গৌড়বহো', কহ্লণের

'রাজতরঙ্গিনী' বিহ্লনের 'বিক্রমাঙ্কচরিত' অজ্ঞাতনামা কবির 'পৃথ্বীরাজবিজয়' ইত্যাদি তার নিদর্শন। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত'ও রচিত হয়েছিল প্রকাশ্যে রাম, অভ্যন্তরে গৌড়েশ্বর রামপাল ও মদনপালের দ্ব্যর্থবোধক কীর্তিকথা নিয়ে।

গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর যখন কৃষ্ণবিরহে শ্রীচৈতন্যের নানা বিকার লক্ষিত হতে থাকে, তখন থেকেই তাঁকে কৃষ্ণের অবতার বলে ভক্তেরা বন্দনা করতে লাগলেন এবং তখন থেকেই তাঁর 'লীলা' নিয়ে পদরচনা শুরু হয়ে গেল। পর বৎসর শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস নিয়ে নীলাচলে চলে গেলে মুরারি গুপ্ত সংস্কৃতে রচনা করলেন 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম্'—যা 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামে বেশি প্রসিদ্ধ। আশ্চর্য চৈতন্যলীলা নিয়ে তাঁর জীবৎকালেই পদ রচনা করলেন, বাসুদেব ঘোষ, নরহরি সরকার প্রমুখ কবিরা।

চৈতন্যকে নিয়ে সংস্কৃতে লেখা গ্রন্থগুলি হল—

(১) 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' রচনাকাল ১৫১৬ থেকে ১৫৪২ বলে মনে করেছেন গবেষকেরা। লোচনদাস ও মুরারি গুপ্তের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন।

(২) কবিকর্ণপুর বা শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র পরমানন্দ সেন সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্য বিষয়ে তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন 'চৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্য, 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক এবং 'গৌর গণোদ্দেশদীপিকা'। প্রথমটি ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দ, দ্বিতীয়টি ১৫৪০-এর আগে এবং তৃতীয়টি ১৫৭৬-৭৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত।

(৩) কাশীধামের প্রবোধানন্দ সরস্বতী ১৪৩টি শ্লোকে 'চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্' নামে একটি স্তোত্র রচনা করেন।

(৪) 'স্বরূপ দামোদরের কড়চা'র উল্লেখ নানা স্থানেই পাওয়া যায় কিন্তু মূল গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। মহাপ্রভুর শেষ জীবনের প্রামাণ্য দলিল এই 'কড়চা'।

এই গ্রন্থগুলির মূল্য অপরিসীম কেননা এগুলি চৈতন্যচরিতের প্রাথমিক ও প্রামাণ্য রচনা।

একক : ১০ 'চৈতন্যভাগবত' ও 'চৈতন্যমঙ্গল'

১০.১ বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত

বাংলা ভাষায় প্রথম চৈতন্য জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন বৃন্দাবন দাস। এই গ্রন্থকে বহুমান দিয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন, 'চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস'। বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের নাম প্রথমে ছিল 'চৈতন্যমঙ্গল'। প্রায় সমকালীন রচনা লোচন দাসের গ্রন্থের নামও 'চৈতন্যমঙ্গল' হওয়ায় কারও মতে বৃন্দাবন দাসের মাতা নারায়ণীর ইচ্ছায় কারও মতে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা এই গ্রন্থকে ভাগবতের সমান মর্যাদা দিয়েছিলেন বলে এর নাম হয় 'চৈতন্য ভাগবত'।

বৃন্দাবন দাসের মাতার নাম নারায়ণী। পিতার নাম জানা যায় না। ইনি ছিলেন শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী। বৃন্দাবন দাস দুই ভাইয়ের নাম করেছেন—শ্রীবাস ও শ্রীরাম। কবি কর্ণপুর আরও একজনের নাম বলেছেন—শ্রীপতি। 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে বলা হয়েছে এঁদের আর এক ভাই নলিনী পণ্ডিতের কন্যা নারায়ণী। বৃন্দাবন দাস কয়েকবার নারায়ণীর নাম বলেছেন। বৃন্দাবন দাসের আবির্ভাবকাল নিয়েও মতপার্থক্য আছে। বৃনদাবন দাস বলছেন, চৈতন্যের যখন ২৩ বছর বয়স অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে ১৪৩০ শকে শ্রীরাসের গৃহে নারায়ণী বিশ্বম্ভরের প্রসাদ খেয়ে 'হা কৃষ্ণ' বলে কেঁদেছিলেন—

চারি বৎসরের সেই উন্নত চরিত।
হা কৃষ্ণ বলিয়া কান্দে নাহিক সম্বিত।।

এই হিসাব ধরে বহু বিতর্কের পরে বৃন্দাবন দাস ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে জন্মগ্রহণ

করেছিলেন বলে মনে করা হয়।

চৈতন্য ভাগবতের রচনাকাল নিয়েও বহু বিতর্ক আছে। ড. বিমানবিহারী মজুমদারের মতে এটি ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দের পরের রচনা। কারণ কবিকর্ণপুরের 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে এর উল্লেখ নেই কিন্তু ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'রা এক উল্লেখ আছে। নিত্যানন্দের আদেশে বৃন্দাবন দাস এই গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু নিত্যানন্দের মৃত্যুর পর এটি সমাপ্ত হয়। নিত্যানন্দের বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি বিদ্বেষ এখানে প্রদর্শন করা হয়েছে কিন্তু নিত্যানন্দর মৃত্যুর ১০/১২ বছর পর পরিস্থিতি এমন ছিল না। এটি সম্ভবত কবির যৌবনকালের রচনা নইলে বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি এত উষ্মার প্রকাশ থাকত না। সবদিক বিচার করে ড. বিমানবিহারী মজুমদার এই গ্রন্থের রচনাকাল আনুমানিক ১৫৪৮ বলে মনে করেন।

'চৈতন্য ভাগবত' শ্রীচৈতন্যের সম্পূর্ণ জীবনীকাব্য বৃন্দাবন দাস এই গ্রন্থকে তিনটি খণ্ডে বিভক্ত করেছেন। (১) আদিখণ্ড—১৫টি অধ্যায়, (২) মধ্যখণ্ড—১৬টি অধ্যায় এবং (৩) অন্ত্যখণ্ড—১০টি অধ্যায়। এর ছত্রসংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার। অন্ত্যখণ্ডটি অতিসংক্ষিপ্ত এবং অনেকে মনে করেন এটি অসম্পূর্ণ।

আদিখণ্ডে চৈতন্যজন্ম থেকে গয়াগমন ও নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই অংশটি গ্রন্থের সবচেয়ে বাস্তব, প্রামাণ্য এবং উৎকৃষ্ট অংশ। বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের শিষ্য, তাঁর কাছে নবদ্বীপে ঘটিত সব ঘটনার অনুপুঙ্খ বর্ণনা তিনি পেয়েছেন। মাতা নারায়ণী এবং অদ্বৈত আচার্যও তাঁকে তথ্য দিয়েছেন। কাজেই অলৌকিকতাকে বাদ দিলে এই অংশের প্রামাণিকতা সবচেয়ে বেশি। গৌরাঙ্গের জন্ম ও বাল্যলীলা, নিত্যানন্দের জন্ম ও বাল্যলীলা, গৌরাঙ্গের বিদ্যাশিক্ষা, অধ্যাপনা, তার্কিকতা, পিতার মৃত্যু, লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে বিবাহ, পূর্ববঙ্গে মন, পত্নীর মৃত্যুসংবাদপ্রাপ্তি, প্রত্যাবর্তন দ্বিতীয় বিবাহ, গয়াগমন, ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, প্রথম কৃষ্ণভক্তির অনুভব, ঈশ্বরপুরীর কাছে মন্ত্রগ্রহণ ও ভাববিহ্বল অবস্থায় নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন।—এই পর্যন্ত আদিখণ্ড।

মধ্যখণ্ডে গয়া প্রত্যাগত চৈতন্যের ভাববিহ্বল অবস্থা, শ্রীবাসের গৃহে নৃত্য-কীর্তন, নবদ্বীপে নিত্যানন্দের আগমন, নিত্যানন্দ-হরিদস কর্তৃক নবদ্বীপে নাম কীর্তন, কাজী দলন, জগাই-মাধাই উদ্ধার, ভক্তি ব্যাকুলতা গোপীভাব ও অবশেষে সন্ন্যাসগ্রহণ।

অন্ত্যখণ্ড অতিসংক্ষিপ্ত। চৈতন্যের কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষাগ্রহণ, রাঢ়দেশে ভ্রমণ, নীলাচলে যাত্রা, নীলাচলে জগন্নাথ বিগ্রহ দর্শন করে মূর্ছা, সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে গমন ও তাঁকে স্বমতে আনয়ন, স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে চৈতন্যের মিলন, গৌড়ে গমন, অদ্বৈতের গৃহে শান্তিপুরে মিলন, গৌড়ে গমন, অদ্বৈতের গৃহে শান্তিপুরে মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ, শ্রীবাস ইত্যাদি কৃষ্ণভক্তের সঙ্গে মিলন। নীলাচলে প্রত্যাবর্তন ও পরে প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপা। চৈতন্যের আদেশে নিত্যানন্দের গৌড়ে ফিরে কৃষ্ণভক্তি প্রচার। অদ্বৈতকর্তৃক চৈতন্যকে অবতাররূপে ঘোষণা ও চৈতন্যকীর্তন। রূপ ও সনাতনের নীলাচলে আগমন। ভাবাবেশে চৈতন্যের কূপমধ্যে পতন ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সম্পর্কে বৃন্দাবন দাস কোনো কথা বলেননি।

গবেষকদের অনুমান, বৃন্দাবন দাস চৈতন্য লীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না। কিন্তু শ্রীবাস, অদ্বৈত, গদাধর, মাতা নারায়ণী ও বিশেষতঃ গুরু নিত্যানন্দের কাছে তিনি চৈতন্যের নবদ্বীপে বাসকালে বিশেষত সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ববর্তী অবস্থার বহু বিবরণ পেয়েছেন যা প্রত্যক্ষদর্শীর কথা। প্রত্যেক বছর রথের সময়ে যেসব ভক্তরা নীলাচলে আসতেন তাদের কাছেও তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছেন। যা তাঁর জানা ছিল না সে সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেন নি বা অতি সংক্ষেপে বলেছেন। নবদ্বীপের ভক্তদের কাছে চৈতন্য ছিলেন কৃষ্ণের অবতার বা স্বয়ং কৃষ্ণ মধ্যে মধ্যে গোপীভাব প্রকাশ করলেও নবদীপের ভক্তদের কাছে তা গুরুত্ব পায়নি। তাই বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে তিনি কৃষ্ণেরই অবতার।

'চৈতন্য ভাগত' অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যে গৌরবান্বিত। চৈতন্য-আবির্ভাবের সমকালীন ধর্মীয় ও সামাজিক পটভূমি যেভাবে বিশ্বাস হয়ে উঠেছে তা কবির দায়িত্ব সচেতনতার পরিচায়ক। সেকালের নবদ্বীপ বা নিকটস্থ অঞ্চলগুলির সমাজ যেভাবে ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্যের প্রদর্শনের স্থান হয়ে উঠেছিল, তার বিস্তৃত বিবরণ আমরা

বৃন্দাবন দাসের রচনা থেকেই পাই। এই ধনীরা ঘোড়া বা দোলায় চড়ে ঘুরতেন এবং সঙ্গে জীবিকা বা আনুকূল্যের জন্য বহু ব্যক্তি পিছনে পিছনে যেতেন। এঁরা রাজার মত জীবনযাপন করতেন। বিবাহ, অন্নপ্রাশন, চণ্ডী বা মনসার পূজা উপলক্ষ্যে বহুব্যয় করতেন। বৃন্দাবন দাস বলেছেন—

দম্ভ করি বিষহরি পূছে কোন জনে।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধনে।।—ইত্যাদি

এঁরা নিম্নবর্ণের মানুষদের ঘৃণা করতেন। শহরে এই পরিবেশ এবং গ্রামে শিক্ষাহীন ভূমিহীন, ধর্মাচরণে অধিকারহীন মানুষের জীবনযাপন ভক্তিহীন আচার-অনুষ্ঠানমূলক ধর্মে এই সময়ে মানুষের পক্ষে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল।

শ্রীচৈতন্যের বাল্যজীবনের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন বৃন্দাবন দাস। মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবন দাস দুজনেই বলেছেন জগন্নাথ মিশ্র দরিদ্রই ছিলেন—'ঘরে মাত্র হয় দরিদ্রতার প্রকাশ'। বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের পর বিশ্বম্ভরের পড়াশুনা বন্ধ হলে শচীদেবীকে জগন্নাথ মিশ্র বলেছিলেন—'পড়িয়াও আমার ঘরেত নাহি ভাত।' নিমাই-এর পত্নী লক্ষ্মীদেবী দরিদ্রেরই কন্যা ছিলেন। বাল্যলীলায় গঙ্গার ঘাটে নিমাই-এর দুষ্টুমি, সহাধ্যায়ীদের ব্যাকরণের কূটতর্কে বিধ্বস্ত করা, পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে শ্রীহট্টীয়াদের অনুকরণে হাসি-তামাশা চৈতন্যের কৌতুকপ্রবণ মানসিকতার পরিচয়। আবার অদ্বৈতকে স্বহস্তে কিলানো তাঁর যৌবনের অসহিষ্ণুতার প্রকাশ।

কাব্যগুণে এবং স্বচ্ছতায় বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' উজ্জ্বল। তাঁর চৈতন্য বর্ণনা—

বিমল হেম জিনি তনু অনুপম রে
তাহে শোভে নানা ফুলদাম।
কদম্ব কেশর জিনি একটি পুলক রে
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম।।

আবার,

পদ্মপত্রে যেন কভু নাহি লাগে জল।
এই মত নিত্যানন্দ স্বরূপ নির্মল।। —ইত্যাদি

তাঁর কাব্যের সৌন্দর্যের কারণ হয়েছে। সমাজচিত্র, বাস্তবতা, ভক্তিভাব, সারল্য সব মিলিয়ে 'চৈতন্য ভাগবত' অসামান্য সৃষ্টি এবং বাংলার ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য দলিল।

১০.২ লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' ও জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত' রচনার অন্তর্বর্তীকালে লোচন দাস ও জয়ানন্দ দুটি চৈতন্য জীবনকাব্য রচনা করেন। লোচনদাসের সম্পূর্ণ নাম লোচনানন্দ দাস। লোচন দাসের গ্রন্থে মুরারি গুপ্তের রচনার প্রভূত প্রভাব আছে কিন্তু বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের নেই। এ থেকে অনুমিত হয় বৃন্দাবন দাসের কাব্যরচনার অল্প পরেই এটি রচিত। লোচন দাস ছিলেন চৈতন্য পার্ষদ নরহরি দাসের শিষ্য—যিনি গৌরনাগরী ভাবের প্রবর্তক ছিলেন। নিতান্তই অনৈতিহাসিকভাবে এই গ্রন্থে গৌর-নাগরী ভাবের কথা আছে। যে কারণে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা এই গ্রন্থকে মর্যাদা দেননি। এর শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১১০০০। গ্রন্থ শেষে আত্ম পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন, তিনি জাতিতে বৈদ্য, নিবাস কোগ্রাম, পিতা কমলাকর দাস এবং মাতা সদানন্দী।

জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলও প্রায় লোচন দাসের কাব্যের সমকালেই রচিত। মোটামুটি এটিকে ১৫৫০-৬০ খ্রিস্টাব্দে এর রচনাকাল বলে গবেষকদের অনুমান। এর শ্লোক সংখ্যা প্রায় ১৩৫০০। নয়টি খণ্ডে গ্রন্থটি বিভক্ত। মহাপ্রভুর নীলাচলে যাত্রা পর্যন্ত ঘটনার পারম্পর্য না থাকলেও উল্লেখ আছে। নীলাচলে যাত্রার পর

থেকে জয়ানন্দের ধারণা খুবই অস্পষ্ট। তবে, একটি বাস্তব তথ্য পরিবেশন করার জন্য তিনি খুবই বিখ্যাত—আষাঢ় মাসের পঞ্চমীতে রথের সামনে বিজয়া নাচতে গিয়ে মহাপ্রভুর পায়ে আঘাত লাগে এবং সেই কারণে তাঁর মৃত্যু হয়। মহাপ্রভুর এত বাস্তব মৃত্যু ঘটনা বৈষ্ণবদের পক্ষে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব হয়নি।

একক : ১১ 'চৈতন্য চরিতামৃত'

১১.১ কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত'

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত' বাংলায় লেখা সর্বশ্রেষ্ঠ চৈতন্য জীবনীকাব্য। শুধু জীবনচরিত হিসাবেই নয়, এই মহাগ্রন্থকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজের সম্পর্কে যা বলেছেন তার চেয়ে বেশি কিছু জানা যায় নি। চরিতামৃতের আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে তিনি বলেছেন, প্রাচীন নৈহাটি গ্রামের কাছে (কাটোয়ার নিকটস্থ) ঝামটুপুরে তাঁর নিবাস ছিল। গৃহে গৃহদেবতার পূজা, অহোরাত্র নাম—সঙ্কীর্তন ইত্যাদি হত। স্বপ্নে নিত্যানন্দের আদেশ পেয়ে কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে আসেন। বৃন্দাবনে রূপ-সনাতন, স্বরূপ দামোদর ইত্যাদির আশ্রয় তিনি পান। চরিতামৃতের ভূমিকায় তিনি রূপ গোস্বামী এবং রঘুনাথের ভৃত্য বলে নিজেকে চিহ্নিত করেছেন। কৃষ্ণদাস কোনো গুরুর নাম করেন নি কিন্তু তাঁর কথা থেকে বোঝা যায়, নিত্যানন্দই তাঁর গুরু ড. সুকুমার সেন বলেছেন, 'কৃষ্ণদাস নিশ্চয়ই নিত্যানন্দের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, নতুবা বৃন্দাবন দাসের মতো অতটা নিত্যানন্দ ভক্তির প্রকাশ হইত না।' বৃন্দাবনের ছয় প্রধান গোস্বামী (ষড়্ গোস্বামী) রূপ-সনাতন, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব ও গোপাল ভট্টকে তিনি শিক্ষাগুরু বলেছেন। কৃষ্ণদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ অথবা বৈদ্য ছিলেন, তা জানা যায় না। ড. সুকুমার সেনের মতে এই কৃষ্ণদাসই সেবক হিসাবে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য গমনের সময় ও বৃন্দাবন যাত্রার সময়ে তাঁর সঙ্গে ছিলেন। মতটি বিতর্কিত।

'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনার পূর্বে কৃষ্ণদাস কবিরাজ দুটি গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেছিলেন, 'সারঙ্গরঙ্গদা' (কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা) ও 'গোবিন্দলীলামৃত'। কৃষ্ণদাসের চৈতন্য চরিতামৃতে'র রচনাকাল সম্পর্কে বহু বিতর্ক আছে। এই পুষ্পিকা শ্লোকটি—

শাকে সিন্ধ্যগ্নিবাণেদৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে!
সূর্য্যেহন্যাসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ।

ধরলে ১৫৩৭শকাব্দ এর রচনাকাল হয় এবং তাহলে কবিকে শতায়ুর চেয়ে বেশি হতে হয়। ড. বিমানবিহারী মজুমদারের মতে 'সিন্ধু' অর্থ ৭ না ধরে ৪ ধরলে রচনাকাল ১৫৩৪ শকাব্দ বা ১৬১২ খ্রিস্টাব্দ বলা যায়। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে এটির রচনাকাল ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দ—কবির বয়স তখন ৮৫ বৎসর যাই হোক, এই গ্রন্থ ১৫৯২ এর আগে রচিত হয়নি। অতিবৃদ্ধ কবি উপসংহারে অত্যন্ত বিনয় সহকারে বলেছেন,

আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠপুত্তলী সমান।।
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির।।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের পাণ্ডিত্য ছিল অনন্য সাধারণ। তাঁর অধীত ভান্ডার থেকে তিনি শ্লোক সংগ্রহ করেছেন। ড. বিমানবিহারী মজুমদার দেখিয়েছেন সবসমেত ১০১১টি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। এতে স্বরূপ দামোদর, শ্রীরূপ, ভাগবত, গীতা, 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক, মুরারি গুপ্তর কড়চা, কবি কর্ণপুরের নাটক ইত্যাদির উদ্ধৃতি

রয়েছে। এর মধ্যে ১০১টি শ্লোক তাঁর নিজের রচনা। ভাবধর্মের দিক থেকে মুরারি গুপ্ত এবং কবি কর্ণপুরের কাছে তিনি বহুভাবে ঋণী।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থ পরিকল্পনা বৃন্দাবন দাসের চেয়ে ভিন্ন। বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে যে সব বর্ণনা বিস্তারিতভাবে আছে তা তিনি হয় ছেড়ে গেছেন, নয় অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। বস্তুত ঐতিহাসিক জীবনী রচনা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না (কোনো মধ্যযুগীয় কাব্যেরই ছিল না)। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সার ভাবধর্মের বিস্তার প্রামাণ্যভাবে দেখানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সুতরাং তাঁর গ্রন্থ খণ্ড নয়, লীলা হিসাবে বিন্যস্ত হয়েছে।

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র আদিলীলা ১৭টি পরিচ্ছেদ, মধ্যলীলা ২৫টি এবং অন্ত্যলীলা ২০টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত।

আদিলীলার প্রথম থেকে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বৈষ্ণব তত্ত্বদর্শন, চৈতন্যাবতারের প্রয়োজনীয়তা, চৈতন্য, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ এবং পরিকরগণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদ বিশেষভাবে উল্লেখ্য কারণ এতে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের ব্যাখ্যাত বৈষ্ণবদর্শন সূত্রাকারে বলা হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা খুব সংক্ষেপে বলা হয়েছে। জন্ম থেকে তেইশ বছর অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প পর্যন্ত এই অংশের বিস্তার। কাজী দলন ও জগাই মাধাই উদ্ধার এই অংশের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

মধ্যলীলার ২৫টি পরিচ্ছেদে চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণ রাঢ়দেশে ভ্রমণ, নীলাচলে যাত্রা সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে স্বমতে আনয়ন, দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ, সেখানে রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলন, দাক্ষিণাত্যের বহু তীথ পরিক্রমা, নীলাচলে গমন, রথের পর আবার দাক্ষিণাত্যে যাত্রা, রায় রামানন্দকে নিয়ে প্রত্যাবর্তন, বৃন্দাবন যাত্রার পূর্বে পুনরায় রাঢ়দেশে গমন, গৌড় থেকে বৃন্দাবন যাত্রা, সেখানে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও প্রত্যাবর্তনের পথে স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে মিলন ও নীলাচলে প্রত্যাবর্তন। মোটামুটি এই ঘটনাগুলি বর্ণিত হয়েছে। মধ্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তৎকালীন বিখ্যাত বৈদান্তিক সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর বিচার ও স্বমতে আনয়ন বিশেষ উল্লেখ্য। এই পরিবর্তন ঘটাতে ১২ দিন সময় লেগেছিল। বাসুদেব সার্বভৌমের বেদান্ত ব্যাখ্যার শেষে চৈতন্যদেব বলেছিলেন,

ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন।।

মধ্যলীলায় রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলন অংশে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রস, গোপীপ্রেম, রাধাপ্রেম, রাধাপ্রেমের পরাকাষ্ঠা তথা প্রেমবিলাসবিবর্ত এগুলি ব্যাখ্যাত হয়েছে। রায় রামানন্দ স্পষ্টতই বলেছেন, চৈতন্য স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপ রাধা-রাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করে তিনি অবতীর্ণ (মূল স্বরূপ দামোদরের শ্লোক: রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতহ্লাদিনী শক্তির স্মাৎ ...ইত্যাদি)। এই প্রশ্নোত্তর শুধু নিজেকে বুঝে নেওয়া। রায় রামানন্দ তাকে বুঝিয়েছেন—

তোমার সম্মুখ দেখোঁ কাঞ্চন পাঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব অঙ্গ ঢাকা।।

মধ্যলীলার আর একটি ঘটনা বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ, সেটি হল রাজা প্রতাপ রুদ্রের মহাপ্রভুর কৃপালাভ। বিষয়ী ও ধনীর মুখ দর্শনের মত মহাপাপ মহাপ্রভু করতে চাননি কিন্তু রথের সামনে রাজার চণ্ডালের মত ঝাঁট দেওয়ার দৃশ্য তাঁকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। তাঁর প্রতি চৈতন্যের কৃপা হয়। মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদ ও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণের তিনটি শক্তির কথা এবং শেষ পর্যন্ত বহুস্তর পরম্পরা পেরিয়ে 'মহাভাবে' পৌঁছানো—দার্শনিকতায় এই অংশ অনন্য।

অন্ত্যলীলার ২০টি পরিচ্ছেদ শ্রীচৈতন্যের দিব্যোন্মাদ অবস্থার বর্ণনা করাই ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজের উদ্দিষ্ট। বৃদ্ধ বয়সে কবি অতন্দ্র নিষ্ঠা, সূক্ষ্ম মননশীলতা ও সংহত বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে ইতিহাস ও রসতত্ত্বকে একত্র গ্রথিত করেছেন। শেষের সাতটি পরিচ্ছেদে এই দিব্যোন্মাদ অবস্থারই চিত্র—

উন্মত্তের প্রায় প্রভু করে গান নৃত্য।
দেহের স্বভাবে করে স্নানভাজন কৃত্য।।
রাত্রি হইলে স্বরূপ রামানন্দেরে লইয়া।
আপন মনের কথা কহে উখাড়িয়া।।

অন্ত্যলীলার শেষ বারো বছরের আর্তি এই মর্মজ্ঞ দার্শনিক কবির হাতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যা পরবর্তীকালে পদাবলীর রাধার ভাবব্যাকুলতার জীবন্ত উৎস।

অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে এই গ্রন্থ লিখতে শুরু করায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের শঙ্কা ছিল পাছে তিনি গ্রন্থ সমাপ্ত করতে না পারেন। তাই আদিলীলা থেকেই সূত্রকারে তিনি তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থাৎ রাগানুগা ভক্তিধর্ম এবং তার ধারক যুগাবতার শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন—পরে আবার তার বিস্তার ঘটিয়েছেন। মনে হতে পারে, এগুলি পুনরুক্তি কিন্তু কৃষ্ণদাসের রচনার গুণে তা আমাদের ভারাক্রান্ত করে না। গভীর মনন, বৈদগ্ধ্য, ভক্তিবিনত নিবেদন এবং কবিত্বশক্তির সাহায্যে দুরূহ বিষয়কে তিনি পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দে গেঁথেছেন। এই দার্শনিক আলোচনার জন্য গদ্যই উপযুক্ত বাহন হত কিন্তু এই গ্রন্থ যুক্তিসহ বিষয় উপস্থাপনায় গদ্যগ্রন্থের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। আবার উপমা, রূপক উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি অলংকারের সহজ ব্যবহার এর দুরূহ দার্শনিক বিষয়কে সহজ করেছে—রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'চিত্র ও সংগীত'। বহু অসাধারণ পংক্তি পাঠকদের মনে গেঁথে আছে। যেমন—

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বুনদ হেম
হেম প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি তার হয় যোগ না হয় তার বিয়োগ
বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য়।।

বা,

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ।।

বা,

অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য ভাসে।
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ পরকাশে।। —ইত্যাদি।

বৈষ্ণব ভক্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই গ্রন্থের সংস্কৃত টীকা রচনা করে একে সব ভারতীয়দের কাছে উন্মুক্ত করেছেন এবং এই মহাগ্রন্থ পূর্বের বহু বৈষ্ণব দার্শনিক গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তাকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

১১.২ চৈতন্য জীবনী ও জীবনীগ্রন্থ বিশ্লেষণ

'চৈতন্য শুধু একজন ব্যক্তি নন, একটি যুগের প্রতিনিধি—শুধু একটি যুগের প্রতিনিধি নন, সর্বযুগের প্রেমভক্তি, ত্যাগ-তিতিক্ষার একমাত্র প্রতীক বলে ইতিহাসে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।' —ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উক্তি সর্বতোভাবে উপযুক্ত। মাত্র আটচল্লিশ বছর জীবনকালে ধর্মে, সমাজে, দার্শনিকতায়, সাংস্কৃতিক চিন্তায় জীবৎকালেই তিনি পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িকতা ও জাতপাতের বিভেদ নির্মুল করার সচেতন চেষ্টা অবশ্যই বৈপ্লবিক। যদিও সেই চেষ্টার ফল মাত্র দুশো বছর স্থায়ী হয়েছিল—যদি তা আধুনিককাল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারত, জাতি আবার সংস্কার বদ্ধতার দিকে পশ্চাদপসারণ না করত তাহলে হয়তো আমরা অন্য একটা জাতিকে দেখতে পেতাম।

আগে বাঙালির ধর্মীয় জীবনে ছিল আচার সর্বস্ব অনুষ্ঠান—চৈতন্য প্রভাবে এল ভক্তিধর্মে বিশ্বাস। সামাজিক

জীবনে ছিল নিম্নশ্রেণীর ও অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা—এল সহনশীলতা। ছিল বিদ্যার দম্ভ—এল নমনীয়তা, সমর্পণ। সাংস্কৃতিক জীবনের পরিবর্তন, যা সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী, যাকে ধর্ম ও সমাজ থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়—তা হল নতুন চিন্তাধারা। শুধু চৈতন্যপূর্ব যুগের মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য ও কিছু বৈষ্ণব পদাবলীর পরে সৃষ্ট হল চৈতন্য জীবনী সাহিত্য। মঙ্গলকাব্যের ধারায় এল পরমত-সহিষ্ণুতা, রুচিশীলতা, মানবের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ইত্যাদি। পদাবলী হয়ে উঠল আরও সংকেতবহ। ভাব, ভাষা, ছন্দের লালিত্যে সমৃদ্ধ এক নতুন প্রকাশ। কীর্তন ও বাউল গানেও শ্রীচৈতন্যই হয়ে উঠলেন কেন্দ্রীয় মানুষ। কীর্তনের নতুন নতুন ধারার জন্মও সম্ভব হল। এর প্রভাব হল সর্বব্যাপী। শাক্ত পদাবলী, মৈমনসিংহ গীতিকা, নাথ সাহিত্য, আরাকান রাজসভার সাহিত্য, সর্বত্র তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল। বাঙালির কূপবদ্ধ জীবনে এই পূর্ণচন্দ্রের উদয় বহুকাল পর্যন্ত নিজ কিরণ বিস্তার করে চলল।

জীবনী সাহিত্যের ক্ষেত্রে সংস্কৃতে রচিত 'মুরারি গুপ্তের কড়চা', কবিকর্ণপুর রচিত 'চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্' চৈতন্য জীবনী সাহিত্যের আকরগ্রন্থ হিসাবে সুপরিচিত। এছাড়া, স্বরূপ দামোদর রচিত শ্লোকের গ্রন্থ না পাওয়া গেলেও এর ব্যবহার 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে এবং আরও নানাস্থানে বহুভাবে আছে।

বাংলায় রচিত বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' তৎকালীন ইতিহাসের এবং চৈতন্যজীবনের সবচেয়ে প্রমাণ্য আকর গ্রন্থ। এছাড়াও শ্রীচৈতন্যের 'গণ' অর্থাৎ, অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস, মুরারি, নিত্যানন্দ, গদাধর ইত্যাদিরও জীবনীর প্রামাণ্য দলিল।

'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্'—মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি অনন্য দার্শনিক মহাগ্রন্থ, এবং শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত। মোটামুটি পয়ার ছন্দে রচিত, প্রায় গদ্যে লেখা এই দুরূহ গ্রন্থ যা পূর্বে রচিত চৈতন্যতত্ত্ব সম্পর্কিত সব গ্রন্থের দ্যুতি ম্লান করে দিয়েছে। গ্রন্থটি খুবই উদ্দেশ্যমূলক—শ্রীচৈতন্যের স্থূল ব্যক্তিজীবনের কাহিনি নয়, শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ লীলার প্রকাশ ঘটানোই এর উদ্দেশ্য ছিল। সে কাজে তিনি পূর্ণ সফল।

১১.৩ সংক্ষিপ্তসার

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত 'চৈতন্যযুগ' হিসাবে চিহ্নিত। কিন্তু ১৪৮৬ থেকে ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চৈতন্য জীবনকাল বিধৃত থাকলেও সমাজে তাঁর প্রগতিবাদী মানবতাবাদী ভক্তি প্লাবনধারা এনেছিল বিপ্লব। সংকীর্ণতার সমস্ত আগল ভেঙে সমাজজীবনে তিনি নিয়ে আসেন সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার স্বাদ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের আলোয় সকলে খুঁজে পান নতুন পথের দিশা। সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে, পদব্রজে ভারত পরিভ্রমণ করে তিনি সর্বধর্ম সমন্বয় সাধন করেন। হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁর প্রেমের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এক নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলেন। এই চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে চরিতসাহিত্য। প্রাচীনকালে রাজ-রাজাদের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে তাঁদের জীবন নিয়ে জীবনীগ্রন্থ রচিত হত। বাংলা সাহিত্যে ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যের জীবিতকালেই তাঁর জীবনী নানান তত্ত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ করে রচিত হয়। বাংলা ভাষায় চৈতন্যজীবনী গ্রন্থকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' প্রথম চৈতন্য জীবনীগ্রন্থ রূপে চিহ্নিত। তবে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থটি শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। এটি বৈষ্ণব তত্ত্ব তথ্য সমৃদ্ধ এবং প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। বৃন্দবান দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থ দুটি পড়লে চৈতন্যদেবের সামগ্রিক জীবন কাহিনির তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ পূর্ণ রূপটি পাওয়া যাবে। গ্রন্থ দুটি মানুষের জীবনরস আশ্রিত সর্বজনীন মানবধর্মে রূপান্তরিত।

একক ১২ ❐ মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ও বিকাশ

গঠন

১২.১ উদ্দেশ্য
১২.২ প্রস্তাবনা
১২.৩ মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব
১২.৪ মঙ্গলকাব্যের নামকরণ
১২.৫ মঙ্গলকাব্যের বিকাশ
১২.৬ বিশ্লেষণ
১২.৭ সংক্ষিপ্তসার

১২.১ উদ্দেশ্য

মঙ্গলকাব্য রচনার দীর্ঘ ইতিহাস ও কাব্যগুলির বৈশিষ্ট্যের ক্রম পরিবর্তনের ধারা এখানে চিহ্নিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যে 'মঙ্গল' শব্দটি যুক্ত হওয়ার নানা কারণ ও ব্যাখ্যা জানতে পারবেন। তিনটি মঙ্গলকাব্যের সমাজচিত্র সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে। সেই সঙ্গে এই কাব্যসমূহ রচনার বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক কারণ, ধর্মীয় ও সাহিত্যিক কারণগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা জন্মাবে। পুরাণের সঙ্গে লোকসাহিত্যের যে মেলবন্ধন মঙ্গলকাব্যে ঘটেছিল তার নানা তথ্য শিক্ষার্থীদের জানানো এই এককের উদ্দেশ্য।

১২.২ প্রস্তাবনা

বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য ধারার ইতিহাস পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় চার'শ বছর। প্রধান তিনটি মঙ্গলকাব্য মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল এবং ধর্মমঙ্গল—এই তিনটি ধারায় মঙ্গলকাব্যের জগৎ সমৃদ্ধ। এই সমস্ত মঙ্গলকাব্যের কাহিনি সংক্ষেপে তুলে ধরা হবে। পুরাণের আদর্শে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে ঐতিহাসিক নানা বিষয়ের সঙ্গে লৌকিক বিভিন্ন কাহিনির মেলবন্ধনও দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এখানকার দেব-দেবীরা দেবত্বের আবরণে গড়া হলেও তাদের মধ্যে রক্তমাংসের মানবিক রূপ কবিরা ফুটিয়ে তুলেছেন। বাংলাদেশের বাস্তব জীবন চিত্রে মঙ্গলকাব্যগুলি সমৃদ্ধ।

১২.৩ মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব

বাংলা কাব্যের পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ এই চার শতাব্দীর ইতিহাসের সমাজ, মানুষ, ধর্ম, সাহিত্যচর্চা, রুচিবোধ ইত্যাদি বিধৃত হয়ে আছে এই সময়ে রচিত মঙ্গলকাব্যে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম রামগতি ন্যায়রত্ন মঙ্গলকাব্যের নাম না করলেও এর কবিদের নাম করেছেন। এরপর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে মঙ্গল কাব্যশাখার বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন।

মনে করা হয়, পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে মঙ্গলকাব্য পূর্ণরূপ পেলেও ব্রতকথা, পাঁচালি লোকগান ইত্যাদি

আকারে মঙ্গলকাব্যের বীজ ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই ছিল। তুর্কী আক্রমণ এবং বৌদ্ধধর্মের ক্রম-অবলুপ্তি, মানুষের মনে ভয় অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস এবং দেবতার অনুগ্রহ দ্বারা দুরবস্থা থেকে মুক্তির চেষ্টা থেকেই সদ্য ফলদাত্রী দেব-দেবীদের প্রতি বিশেষভাবে বিশ্বাসের জন্ম হয়। প্রথমে নিম্নবর্ণের দ্বারা পূজিত হলেও ধর্ম, মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি দেবতারা উচ্চবর্ণের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠলেন। অবশ্য ধর্মঠাকুর বহুকালই ব্রাত্য থেকে যান। উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণের লোকের আচার-অনুষ্ঠানের কাছাকাছি আসায় তাদের মধ্যে মিলন-মিশ্রণ ঘটল। লোকবিশ্বাসের আধারের উপর পূর্বের পৌরাণিক দেবদেবীর স্মৃতি, বৌদ্ধধর্মের তান্ত্রিক কল্পনা এবং সমকালীন সমাজের চিত্রকে ভিত্তি করে গড়ে উঠল মঙ্গলকাব্য। 'বাংলার জলবায়ুতে দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্করণ যে কিভাবে একদেহে লীন হইয়া আছে মঙ্গলকাব্যগুলি তাহারই পরিচয়।' রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুসারে সামাজিক অনিশ্চয়তা ও দোলাচলের কালে জনসাধারণের সমর্থন লাভ করে দেবদেবীরা দুর্নিবার হয়ে উঠেছিলেন এবং বিনা দোষে দয়া করা বা নিগ্রহ করার দ্বারা তাঁদের শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। 'রাগদ্বেষ-প্রসাদ-অপ্রসাদের লীলা-চঞ্চলা যদৃচ্ছচারিণী শক্তিই তখনকার কালের দেবত্বের চরম আদর্শ।'

(রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

১২.৪ মঙ্গলকাব্যের নামকরণ

'মঙ্গলকাব্য' শব্দটির অর্থ ও উৎস নিয়ে অনেক মত প্রচলিত আছে। প্রাচীন ভারতে 'মঙ্গল' নামে একটি রাগ প্রচলিত ছিল—মঙ্গলকাব্যগুলি মঙ্গলরাগে গীত হত। 'মঙ্গল' দ্রাবিড় শব্দ-এর অর্থ গমন বা যাওয়া। মঙ্গলকাব্যগুলি নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে গীত হত। আবার এগুলি অষ্টমঙ্গলা নামেও পরিচিত ছিল। মঙ্গলবার থেকে মঙ্গলবার আটদিন ধরে গীত হত বলেও 'মঙ্গল' কথাটি আসা সম্ভব। পূর্ববঙ্গে রাত জেগে গান গাওয়া হত বলে এগুলি 'রয়ানী' নামে বেশি পরিচিত। 'চৈতন্য ভাগবতের' পূর্ব থেকেই 'মঙ্গল' শব্দটির প্রয়োগ ছিল, যেমন 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে। আবার 'প্রভু কন গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল'। 'গীতগোবিন্দে এর প্রথম প্রয়োগ দেখা যায়—'মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি'। যাই হোক, এই কাব্য পাঠ বা শ্রবণ করলে বা ঘরে রাখলেও মঙ্গল হয় এই প্রচলিত মত বিভিন্ন ধরনের মঙ্গলকাব্য রচনায় কবিদের উৎসাহিত করেছিল।

১২.৫ মঙ্গলকাব্যের বিকাশ

প্রথমে একেবারে অনার্য মূল থেকে জাত হলেও পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ব্রতকথাগুলির উপর হিন্দুত্বের বা পৌরাণিক মাহাত্ম্যের প্রভাব পড়তে থাকে। অবশ্যই চৈতন্য-পরবর্তী মঙ্গলকাব্য পূর্বতন ধারাকে বজায় রেখেও পরিশীলিত হয়ে ওঠে।

মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্দিষ্ট বিষয় দেবতার মাহাত্ম কীর্তন। কিন্তু মানব-সম্পৃক্তি ছাড়া কিছুই হয় না, তাই প্রথমে দেবতা পরে মানুষ। পুরাণ-আশ্রয়ী দেবলীলার কথা নিয়ে 'দেবখণ্ড' ও মানুষের জীবনে দেবতারা অপ্রত্যাশিত করুণা নিয়ে 'নরখণ্ড'। স্বর্গের কোনো দেব বা দেবী নিজ পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে স্বর্গের কোনো দেবপুত্রকে বা অপ্সরা বা নর্তক-নর্তকীকে অভিশাপ দিয়ে মর্তে প্রেরণ করেছেন। তারা জন্ম নিয়েই নিজের অতীত ভুলে গেছে, পরে হঠাৎই বা স্বপ্নাদেশ পেয়ে বা অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দিয়ে যে দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন করা কবির উদ্দিষ্ট তার কাছে নতজানু হয়েছে—তার পূজা প্রচার করেছে। কাব্যগুলিতে দেবচরিত্রের একরোখা

স্বভাব, ক্ষমাহীনতা, দুর্বল মানুষের উপর নানাপ্রকার পরীক্ষার ছলে অত্যাচার নিশ্চয়ই তাদের দেবমহিমাকে উজ্জ্বল করেনি বরং তাদের পৌরাণিক মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

সব মঙ্গলকাব্যেরই কিছু সাধারণ বর্ণনা আছে। গণেশাদি পঞ্চদেবতার বন্দনা, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, সৃষ্টির রহস্য ইত্যাদি এবং দেবস্থানীয়দের শাপভ্রষ্ট হয়ে জন্মলাভ। এরপর নরখণ্ডে বারমাস্যা, নারীগণের পতিনিন্দা, চৌতিশা, পাকপ্রণালী বর্ণনা, বিবাহ আচার, বিশ্বকর্মার শিল্পকীর্তি সদাগরের সমুদ্রযাত্রা ইত্যাদি মোটামুটি সব মঙ্গলকাব্যেই আছে।

মঙ্গলকাব্যে রাজা বা রাজবংশের স্থানে সাধারণ মানুষের প্রাধান্য অনেকটাই বেশি। তাদের প্রত্যাশ্যা, দুঃখ-বেদনা কবিদের কাছে মর্যাদা লাভ করেছে। কালকেতু-ফুল্লরার প্রাত্যহিক অভাব দূরীকরণ, লহনা-খুল্লনার স্বামীপ্রেমের আকাঙ্ক্ষা, সনকার স-পুত্র পুত্রবধূ নিয়ে সংসার-যাত্রার অভিলাষ কবির দৃষ্টিতে জীবন্ত।

'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'ধর্মমঙ্গল' মঙ্গলকাব্যের এই তিনটি মূল শ্রেণী ছাড়াও আরও বহু মঙ্গলকাব্য বাংলা সাহিত্যে আছে যেমন, চৈতন্যমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, অদ্বৈতমঙ্গল ইত্যাদি। এছাড়াও 'গঙ্গামঙ্গল', 'শিবায়ন' ইত্যাদি তো আছেই। জীবনী, ব্রতকথা, পাঁচালি, লৌকিক কাহিনিই এর আশ্রয়। পরে এতে মিশেছে পৌরাণিক উপকরণ। সমকালীন দোলাচলতা ও বিশ্বাসহীনতা থেকে জাত এই কাব্যধারা প্রতিভাবান কবিদের হাতে পড়ে হয়ে উঠেছে অমূল্য জাতীয় সম্পদ যার শেষ দৃষ্টান্ত ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল।

১২.৬ বিশ্লেষণ

সংস্কৃত আখ্যান কাব্যের স্মৃতি থেকেই মঙ্গলকাব্যের কবিরা বাংলা আখ্যানকাব্য রচনা করেছিলেন। কবিরা বেশিরভাগই ছিলেন সুপণ্ডিত। সংস্কৃত শাস্ত্র ও পুরাণে স্নাত। তাই লৌকিক কাহিনি ও ব্রতকথাকে কাব্যের স্তরে উন্নীত করতে গিয়ে পুরাণ ও সংস্কৃত কাব্যের আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু তৎকালীন ধর্ম, মানুষ ও সমাজ অনায়াসেই তাঁদের রচনার বিষয়ীভূত হয়েছে। যদিও একই বিষয় নিয়ে বহু কবি কাব্যরচনা করেছেন—যা 'মঙ্গলকাব্যের পুচ্ছগ্রাহিতা' বলে অভিহিত, তা সত্ত্বেও তাঁদের বেশ কিছু মৌলিকত্ব অস্বীকার করা যায় না। বেশ কিছু বহুমূল্য চরিত্র—'চণ্ডীমঙ্গলে'র মুরারি শীল, ভাঁড়ুদত্ত, মনসামঙ্গলের গোদা, অন্নদামঙ্গলের হীরা মালিনী বা ঈশ্বরী পাটানি, 'ধর্মমঙ্গলের' কালু ডোম ও লখাই ডোমনী, পাঠকচিত্তে তাদের মৌলিকতা নিয়ে অমর। চৈতন্য-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কাব্যধারার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনও কাব্যকে যেভাবে রুচিশীল করে তুলেছে, তাও লক্ষনীয়।

অবশ্যই বহু গতানুগতিক বর্ণনা আমাদের ক্লান্ত করে। যেমন, পশুপাখির নামের তালিকা, খাদ্যদ্রব্যের তালিকা, বিভিন্ন যৌতুক দ্রব্যের তালিকা, দেবদেবীর নামের তালিকা ইত্যাদি। আবার তৎকালীন মানুষের সামাজিক অবস্থার পরিচয়ও এই আচার অনুষ্ঠানের তালিকা থেকে পাওয়া যায় যা অত্যন্ত মূল্যবান।

অনেকে মঙ্গলকাব্যের চরিত্র, পটভূমি, গ্রন্থশেষের সমীকরণের মধ্যে মহাকাব্যের ব্যাপ্তি খুঁজেছেন—হয়তো সেটা সম্ভবতও ছিল কিন্তু সমকালীন সমাজকে তৃপ্ত করতে গিয়ে, তুচ্ছ বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিয়ে যে ব্যাপ্তি এবং বিশালতা মহাকাব্যের বিশেষ আবহ মঙ্গলকাব্যের কবিদের রচনায় তার প্রকাশ ঘটেনি, চারশত বছরের কাব্যেতিহাস সংস্কৃতি, সমাজ ও ধর্মের পরিবর্তন ও প্রবহমানতার একটি উল্লেখযোগ্য দলিল হিসাবেই এগুলি সার্থক হয়ে আছে।

১২.৭ সংক্ষিপ্তসার

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী—এই সময়কালের মধ্যে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণের ওপর এই কাব্যের প্রভাব অপরিসীম। মনসা, চণ্ডী, ধর্ম—এই সমস্ত লৌকিক দেব-দেবীর কথা আছে এখানে। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সাহিত্যে ও সমাজে এদের প্রভাব ছড়িয়ে আছে। বিদেশি আক্রমণ ও অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্য এই সমস্ত দেব-দেবীর ভক্তরা ঐকান্তিক প্রার্থনা জানালে তারাও বরাভয় মূর্তি নিয়ে হাজির হয়। এভাবেই রচিত হয় মঙ্গলকাব্য। এখানে উল্লেখ আছে 'মঙ্গল' নামকরণের বিষয়। এছাড়াও মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাসে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সবমিলিয়ে মঙ্গলকাব্যগুলি সমাজ ও ধর্মের প্রবহমানতার এক উল্লেখযোগ্য দলিল।

একক ১৩-১৪ ❐ মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল

গঠন

১৩-১৪.১ উদ্দেশ্য
১৩.২ প্রস্তাবনা
১৩.৩ মনসার উদ্ভব ও কাব্যকথা
১৩.৪ মনসামঙ্গলের কবি
১৩.৫ সামগ্রিক বিশ্লেষণ
১৪.১ কাব্য পরিচয়
১৪.২ ধর্মমঙ্গলের কবি
১৪.৩ সামগ্রিক বিশ্লেষণ
১৪.৪ সংক্ষিপ্তসার

১৩-১৪.১ উদ্দেশ্য

মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল কাব্যরচনার বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক কারণ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা এই একক থেকে পাওয়া যাবে। এই দুই মঙ্গলকাব্যের কাহিনি এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ের মঙ্গলকাব্য রচয়িতাদের কবি-পরিচিতির মাধ্যমে কাব্যের স্রষ্টাদের সম্পর্কেও একটা ধারণা জন্মাবে। এইসব মঙ্গলকাব্য রচনার পেছনে যে ধর্মীয় ও সাহিত্যের কারণ আছে তারও ইঙ্গিত শিক্ষার্থীরা পাবেন এখানে।

১৩.২ প্রস্তাবনা

চৈতন্য পূর্বযুগে মনসামঙ্গল কাব্যের সৃষ্টি। এই কাব্যের রচয়িতার সংখ্যা বেশি। তুর্কী বিজয়ের পরে জাতীয় জীবনে যে বিপর্যয় দেখা দেয়—তা থেকে মুক্তি পেতে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে লোকায়ত সংস্কৃতির মেলবন্ধন তৈরির চেষ্টা হয়। এর ফলে অনার্য এবং লোকায়ত দেব-দেবীরা সমাজে সমাদর পেতে শুরু করে। মনসা, ধর্মঠাকুর এভাবে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। পুরাণের আদর্শ রচিত এইসব মঙ্গলকাব্যগুলিতে ঐতিহাসিক নানা বিষয়, লৌকিক ব্রতকথা, বাঙালির বহির্বাণিজ্য এবং যুদ্ধাদির বর্ণনাও আছে। বাংলাদেশের বাস্তব জীবনচিত্রে এইসব মঙ্গলকাব্যগুলি সমৃদ্ধ।

১৩.৩ মনসার উদ্ভব ও কাব্যকথা

মঙ্গলকাব্যের মূল তিনটি ধারার মধ্যে প্রথম মনসামঙ্গলই পূর্ণ সাহিত্যিক রূপ পেয়েছে। চৈতন্যভাগবতে উল্লেখ আছে—'দম্ভকরি বিষহরি পূজে কোন জনে।' অর্থাৎ তখনই মনসা উচ্চ সম্প্রদায়ে স্বীকৃত হয়েছেন। ড. সুকুমার সেনের মতে দেবী ভাবনায় ঋগ্বেদের সময় থেকেই মনসার অস্তিত্ব ছিল। তিনি মায়ূরী। বৌদ্ধ মহাযান মতেও ইনি 'বিষনাশের আরোগ্যের এবং বিদ্যার দেবতা।' এঁর আর একটি নাম জাগুলি। মনসামঙ্গলের প্রাচীন

কবি বিপ্রদাস 'জাগুলি' নামের লোক ব্যুৎপত্তি দিয়েছেন—'জাগিয়া জাগুলি নাম সিজবৃক্ষে স্থিতি।' আবার মনসাকে 'চেঙ্গমুড়ি কানি'ও বলা হয়েছে।

মনসামঙ্গল আটদিন ধরে গাওয়া হত। সাধারণত সারারাত পালাগান হত বলে একে 'জাগরণ' বা 'রয়ানী'ও বলা হত। মহাভারতে নাগজাতি ও জরৎকারু মুনির সঙ্গে মনসার বিবাহের উল্লেখ আছে। এঁদের সন্তান আস্তীক জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে সর্পকুলকে রক্ষা করেন। মনসাকে মঙ্গলকাব্যে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হয়েছে যথা, পদ্মাবতী, কেতকা, বিষহরী, জরৎকারু ইত্যাদি। 'মনসা' নামের উৎস হিসাবে বলা হয়েছে কশ্যপ ঋষির মন থেকে সৃষ্ট, তাই 'মনসা'। আবার কেউ দক্ষিণ ভারতে 'মঞ্চাম্মা' থেকে এই নাম এসেছে বলে মনে করেন। যাই হোক ড. সুকুমার সেনের মতে, 'আদি দেব নিরঞ্জনের কামবাসনোদ্ভূত সর্পরাজ্ঞী মনসার সঙ্গে পর্বতবাসিনী কুমারী বিষবিদ্যা ও সিজবৃক্ষ পূজার সংযোগের ফলে পাঁচালি কাব্যের মনসা সৃষ্ট হইয়াছে।' ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, কৌম সমাজে সাপ প্রজনন শক্তির প্রতীক হিসাবে পূজিত এবং সর্পদেবী মনসার কোলে একটি ফল বা পূর্ণ সাপের প্রতিকৃতি বিদ্যমান। মোটামুটি পাল যুগ থেকে এই দেবী ক্রম-প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। অবশ্য মনসামঙ্গল কাব্যে মনসাকে শিবের কন্যা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের নানাস্থানে বহু মনসামঙ্গল কাব্য পাওয়া গেছে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কাব্যগুলির চলিত নাম মনসামঙ্গল এবং পূর্ববঙ্গে পদ্মাপুরাণ। ড. সুকুমার সেন অঞ্চলভেদে এদের চারটি শ্রেণিবিভাগ করেছেন।

১। রাঢ়ের মনসামঙ্গল—কবি : বিষ্ণু পাল, কেতকাদাস ক্ষমানন্দ, সীতারাম দাস, রসিক মিশ্র ও বাণেশ্বর রায়।

২। পূর্ববঙ্গের পদ্মাপুরাণ—কবি : নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, বংশী দাস ও ষষ্ঠীবর।

৩। উত্তরবঙ্গ বা কামরূপের মনসামঙ্গল—কবি : তন্দ্রবিভূতি, জগৎজীবন ঘোষাল, মনকর, দুর্গাবর ও জীবনকৃষ্ণ মৈত্র।

৪। বিহারী মনসামঙ্গল—কাহিনি ও ব্রত আকারে পাওয়া গেলেও এর কোনো কবির নাম পাওয়া যায়নি।

বিভিন্ন স্থানের মনসামঙ্গল কাব্য কাহিনিগত কিছু পার্থক্য থাকলেও কাহিনি মোটামুটি এইরকম, প্রথমে দেবখণ্ড—মনসার জনম থেকে পূজা প্রচারের কাহিনি। কাহিনিটি এইরকম, শিবের কন্যা মনসার পদ্মবনে জন্ম হলে শিব তাঁকে চণ্ডীর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন কিন্তু ধরা পড়ে যান। চণ্ডী ও মনসার কলহের সময় চণ্ডী মনসার একটি চোখ কানা করে দেন। মনসার বিষে চণ্ডী মূর্ছিত হলে মনসা আবার তাঁর চেতনা ফিরিয়ে দেন। সমুদ্রমন্থনের সময়ে বিষপান করে মহাদেব অচৈতন্য হলে মনসা তাঁকে সুস্থ করেন। চণ্ডীর সঙ্গে তাঁর বিবাহের ফলে পদ্মাবতী জয়ন্তীতে পুরী নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন। জরৎকারু মুনির সঙ্গে মনসার বিবাহ হয়. এবং আস্তীকের জন্ম হয়। এই পর্যন্ত দেবখণ্ড।

নরখণ্ড মনসার মর্তে পূজা প্রচারের কাহিনি। এই কাহিনির কেন্দ্রে আছেন চম্পকনগরের শিবভক্ত বণিক চাঁদ সদাগর। সে পূর্বজন্মে দেবলোকে ছিল এবং মনসার দ্বারা শাপগ্রস্ত হয়েছিল। কিছুতেই শিবভক্ত চাঁদ সদাগরকে নিজ পূজা করাতে না পেরে মনসা চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করলেন, চাঁদের বন্ধু ধন্বন্তরী ও শঙ্কর গারুড়ীকে হত্যা করলেন, চাঁদের বাগান ধ্বংস করলেন, চাঁদের ছয় পুত্রকে হত্যা করলেন। চাঁদ বাণিজ্যে গেলে তার চৌদ্দডিঙা ডুবিয়ে দিলেন, চাঁদ পদ্মবনে আশ্রয় নিল না কারণ মনসার নাম পদ্মা। ইতিমধ্যে চাঁদের শেষ সন্তানের জন্ম হয়েছে, নাম লক্ষ্মীন্দর। চাঁদ মুমূর্ষ অবস্থায় ফিরে এসে পুত্রমুখ দেখল। পুত্রের বিবাহ দিল উজানি নগরের শাহবেনের কন্যা রূপবতী বেহুলার সঙ্গে। মনসার ষড়যন্ত্রে বিবাহ রাত্রিতে লোহার বাসর ঘরে চাঁদকে সাপে কাটল। স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে বেহুলা ভেসে গেল দেবলোকের উদ্দেশে। অনেক বিপদ পার হয়ে

দেবলোকে পৌঁছে, দেবতাদের সন্তুষ্ট করে স্বামী ও ছয় ভাসুরকে বাঁচিয়ে নিয়ে চাঁদ বণিকের চৌদ্দ ডিঙা উদ্ধার করে বেহুলা দেশে ফিরে এল—মনসাকে সে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে, চাঁদকে দিয়ে মনসার পূজা করাবে, নইলে সব নষ্ট হবে। সকলে অনেক কাকুতি-মিনতি করার পর চাঁদ পিছন ফিরে বাঁ হাতে মনসাকে একটি ফুল দিতে স্বীকৃত হল। অগত্যা মনসাকে তাতেই রাজি হতে হয়। মর্তে মনসার পূজা প্রচলিত হল। স্বর্গের শাপভ্রষ্ট গন্ধর্ব উষা ও অনিরুদ্ধ অর্থাৎ বেহুলা ও লক্ষ্মীন্দর—সশরীরে স্বর্গে গেল।

১৩.৪ মনসামঙ্গলের কবি

কানা হরিদত্ত—মনসামঙ্গলের কবি বিয়গুপ্ত এই কবি সম্পর্কে একটি অশ্রদ্ধেয় উক্তি করেছেন—

মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।।

মনে করা হয়, খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগেই হরিদত্তের গীত লুপ্ত হয়ে যায়। ড. দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, 'কানা হরিদত্ত মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে তাঁর মনসামঙ্গল রচনা করেন।' ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, বিজয় গুপ্ত যেভাবে কানা হরিদত্তর পদ উদ্ধৃত করেছেন, তাতে তা আদৌ লুপ্ত হয়নি। যাই হোক, হরিদত্তই মনসামঙ্গলের সর্বস্বীকৃত প্রথম কবি।

নারায়ণ দেব—মনসামঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি নারায়ণ দেব। তাঁর আবির্ভাবকাল সম্পর্কে তিনি নিজে কিছু উল্লেখ করেননি। কিন্তু তাঁর উত্তরপুরুষ এখনো বর্তমান। সেই বিচারে তাঁকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান করা হয়েছে। রাঢ় থেকে এসে তাঁর পূর্বপুরুষ মৈমনসিংহ জেলার কিশোর গঞ্জ মহকুমার অধীন বোরগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। শুধু বাংলায় নয়, আসামেও নারায়ণ দেবের কাব্য বহুল প্রচার লাভ করেছিল। কেউ কেউ অনুমান করেছেন, নারায়ণ দেবের একটি উপাধি ছিল 'সুকবিবল্লভ'। মঙ্গলকাব্যের মূল নীতি অনুসারে নিজের কাব্যকে তিনি দেবী পদ্মার স্বপ্নাদেশজাত বলেছেন। কাব্যের পৌরাণিক অংশের ক্ষেত্রে সংস্কৃত পুরাণের আদর্শ মান্য করেছেন কারণ তাঁর সামনে অন্য আদর্শ ছিল না।

নারায়ণ দেবের—'পদ্মাপুরাণ' তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে কবির আত্মবিরণী ও দেববন্দনা। দ্বিতীয় খণ্ডে পৌরাণিক আখ্যান ও তৃতীয় খণ্ডে চাঁদ সদাগরের কাহিনি বলা হয়েছে। নারায়ণ দেবের দ্বিতীয় খণ্ডের বিস্তার বেশি এবং এ বিষয়ে তিনি শৈবপুরাণ ও সংস্কৃতি কাব্যের উপর নির্ভরশীল।

সুকবি নারায়ণ দেবের তৃতীয় খণ্ড করুণরসের স্বতঃস্ফূর্ত বর্ণনায় সবচেয়ে উজ্জ্বল। বাঁ হাতে ফুল ফেলে দেওয়া চাঁদের চরিত্রের সঙ্গে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। বেহুলার প্রত্যাবর্তন ও স্বর্গে গমন নারায়ণ দেবের কাব্যে একটি রূপকের আকার নিয়েছে। নারায়ণ দেবের কাব্যে কিছু অশ্লীলতা থাকলেও সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে একে বাড়াবাড়ি বলা যায় না। করুণরস ও হাস্যরসে নারায়ণ দেবের সমপরিমাণ দক্ষতা ছিল। তাঁর কয়েকটি ব্যঙ্গোক্তি প্রায় প্রবাদের রূপ লাভ করেছে। যেমন,

বানরের মুখে যেন ঝুনা নারিকেল।
বা
বৃদ্ধ হইলে পাইকের ভাবকী মাত্র সার। —ইত্যাদি

পরবর্তী বহু কবি নারায়ণ দেবের অনুসরণ করেছেন। নারায়ণ দেবের আসামে প্রাপ্ত পুঁথিতে স্থানীয় ও কালগত কারণে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বহু পুঁথি আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রাপ্ত সব পুঁথিতেই বেশ কিছু প্রক্ষেপ ঘটেছে বলে গবেষকদের অনুমান।

বিজয় গুপ্ত—বিজয় গুপ্ত মনসামঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। পূর্ববঙ্গে বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলের প্রচারই সর্বাধিক। এঁর পুঁথির সংখ্যা বেশি নয়। বিজয় গুপ্তের কাব্যের আত্মপরিচয় অংশে কাব্য রচনার সাল তারিখ স্পষ্টভাবে বলা আছে। বহু স্থানের নাম ও বিবরণ আছে। কবির তথ্যানুযায়ী ফুল্লশ্রী গ্রামে তাঁর জন্ম। গৈলা ফুল্লশ্রী বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত। তাঁদের বৈদ্য বংশের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এখনও অক্ষুণ্ণ। গবেষকদের অনুমান বিজয় গুপ্ত ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে দেবীর স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন এবং কাব্যরচনা করেন। কালনির্ণায়ক শ্লোকটিতে একটু ভুল ছিল।

পূর্ববঙ্গে বিজয় গুপ্তের কবিখ্যাতি সর্বাধিক ছিল। পুঁথি বেশি না পাওয়া গেলেও এগুলির অনেক অনুলিপি তৈরি হয়েছিল ফলে পাঠভেদও স্বাভাবিক। প্রাক-চৈতন্য সমাজের যে অকৃত্রিম বাস্তব চিত্র তা বিজয় গুপ্তের রচনায় আছে। এঁর কাব্যে করুণরসের স্থান খুব সংক্ষিপ্ত। কেবল সনকার পুত্রের মৃত্যুর বর্ণনায় তা মনকে স্পর্শ করে। সনকাই একমাত্র চরিত্র যা অত্যন্ত বাস্তব এবং সর্বোৎকৃষ্ট। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে 'একদিকে মনসার হৃদয়হীনতা এবং অন্যদিকে সনকার একান্ত স্নেহশীলতা এই উভয়ের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া বিজয় গুপ্তের কাহিনি উচ্চাঙ্গের কাব্যরস সৃষ্টিতে সার্থক হইয়াছে।' হাস্যরসের ক্ষেত্রে তাঁর রচনায় অশ্লীলতার প্রাধান্য আছে। এই কাব্যে দেবাদিদেব মহাদেবের মহিমা একেবারেই ধূল্যবলুণ্ঠিত। অন্য কোনো দেবতারও কোনো দেবোচিত গুণ নেই। মনসার প্রতিশোধস্পৃহা ও কলহ পরায়ণতা তাকে আরও রুক্ষ করে তুলেছে। ছন্দের ক্ষেত্রে পয়ার ও ত্রিপদী ছাড়াও লাচাড়ী ও একাবলী ছন্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এটিকে ভারতচন্দ্রের পূর্বসূরিত্ব বলা যেতে পারে। ব্যাজস্তুতি অলংকারের ক্ষেত্রেও তাই। বিজয় গুপ্ত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন তাই পুরাণকথায় তাঁকে খুবই স্বচ্ছন্দ দেখা যায়। বিজয় গুপ্ত মনসার ভক্ত ছিলেন কিন্তু বহুস্থানে তাঁর কাব্য বিষ্ণুভক্তির প্রকাশ দেখা যায়। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'চরিত্র চিত্রণ, কাহিনির বয়ন-কৌশল, কাব্যসৌন্দর্য প্রভৃতি খুঁটিয়া দেখিলে নারায়ণ দেবকেই উৎকৃষ্টতর মনে হইবে।' বিজয়গুপ্ত পূর্ববঙ্গের জনপ্রিয় কবি হলেও গবেষকদের মতে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা তাঁকে দেওয়া যায় না।

বিপ্রদাস পিপিলাই—বিপ্রদাস পিপিলাইকে পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম মনসামঙ্গল রচয়িতা বলা যেতে পারে। তাঁর মনসামঙ্গল রচনার স্পষ্ট কালনির্ণয় পাওয়া গেছে। ড. সুকুমার সেনের মতে ১৪৯৫-৯৬ খ্রিস্টাব্দে এই কাব্য লেখা হয়েছিল। বিপ্রদাস এই কাব্যকে একবার 'মনসাবিজয়' বলেছেন আবার 'মনসাচরিত'ও বলেছেন। বসিরহাটের অন্তর্গত বাদুড়িয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। কলকাতার এত কাছে হলেও ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের আগে তাঁর সম্পর্কে কারও কিছু জানা ছিল না। দত্তপুকুর থেকে তাঁর তিনটি পুঁথি পাওয়া গেছে সবগুলিই খণ্ডিত। ভাষা ও রচনাভঙ্গি অর্বাচীনকালের। কলকাতা ও কাছাকাছি যে স্থানগুলির উল্লেখ আছে যেমন নিমাইতীর্থ, শ্রীপাট খড়দহ সবই আধুনিক। স্পষ্টতঃই কাব্যটিতে বহু প্রক্ষেপ ঘটেছে।

বিপ্রদাসের হাসেন-হুসেন পালা দীর্ঘতর ও সুপরিকল্পিত। মুসলিম সমাজের চিত্র এখানে খুব বাস্তব। মনসা চরিত্রে স্নেহ-মমতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন বিপ্রদাস যা অন্য কবির কাব্যে নেই। হাস্যরস বিপ্রদাসের কাব্যে বিরল, নরনারী চরিত্র গতানুগতিক। যে অনমনীয় চাঁদ সদাগর মনসাঙ্গল কাব্যের সম্পদ বিপ্রদাসের রচনায় চাঁদের সেই মাহাত্ম্য নেই। চাঁদ সদাগর মনসাকে নিজের মাথায় পদাঘাত করতে বলেছেন এবং মনসা, 'হাসি পদাঘাত কৈলা চাঁদের মস্তকে।' কিছু অভিনবত্ব থাকলে বিপ্রদাসকে খুব বড় কবি বলা যায় না।

তন্ত্রবিভূতি—মালদহ জেলা থেকে ড. আশুতোষ দাস একটি পুঁথি আবষ্কার করেন, কবির নাম তন্ত্রবিভূতি। ইনি আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর কবি। ইনি তান্ত্রিক ছিলেন বলে বিভূতি নামের সঙ্গে 'তন্ত্র' যোগ হয়েছে। এঁর কাব্যের নাম 'মনসাপুরাণ' কিন্তু উত্তরবঙ্গের এটি তন্ত্রবিভূতি নামেই পরিচিত।

উত্তরবঙ্গের অনেক কবি তন্ত্রবিভূতির দ্বারা শুধু প্রভাবিত হন নি, কাব্যের অনেক অংশ আত্মসাৎ করেছেন। যেমন, জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবন মৈত্র প্রমুখ কবিরা। তন্ত্রবিভূতির কাহিনির বয়নে, রূপবর্ণনা ও করুণরসের বর্ণনায় নৈপুণ্য ছিল। মঙ্গলকাব্যের সাধারণ রীতি অনুযায়ী স্বপ্নাদেশ, দেবখণ্ড ইত্যাদি রচিত। জরৎকারুর বিবাহে উপঢৌকন দানে তালিকায় সমাজ-জীবনের প্রতিফলন আছে। কল্পনা ও মানবীয় সহানুভূতির জন্য তাঁকে একজন উচ্চ পর্যায়ের কবি বলা যেতে পারে।

জগজ্জীবন ঘোষাল—উত্তরবঙ্গের অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার কোচ-আমোরা বা কুড়িয়া মোড়া গ্রামে জগজ্জীবন ঘোষালের বাস ছিল। কবির পিতার নাম রূপ, মাতার নাম রেবতী। এঁর রচনায় ক্ষেমানন্দের উল্লেখ পাওয়া যায় সুতরাং ধরে নিতে হয় ইনি ক্ষেমানন্দর পরবর্তী কবি। জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল দুই খণ্ডে বিভক্ত। 'দেবখণ্ড' ও 'বণিক খণ্ড'। এগুলি সম্পূর্ণই পাওয়া গেছে। কাহিনি বয়নে ইনি কিছু আলাদা। 'বণিক খণ্ডে' ইনি তন্ত্রবিভূতিকে অনুসরণ করেছেন। কাব্যটিতে ধর্মমঙ্গলের প্রভাব আছে। জগজ্জীবনের ধর্মমঙ্গলের প্রভাব আছে। জগজ্জীবনের সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনায় 'শূন্যপুরাণ' ও নাথ সাহিত্যের সঙ্গে মিল আছে। আদিরস ও অলংককরণের বাড়াবাড়ি এই কাব্যে আছে।

দ্বিজ বংশীদাস—মনসামঙ্গলের জনপ্রিয় কবি 'দ্বিজ বশীদাস' মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাতুয়ারি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানটি নায়ারণদেবের জন্মস্থানের কাছাকাছি। বংশীদাসের মুদ্রিত পুঁথিতে দেখা যায়, ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'পদ্মাপুরাণ' রচনা করেন। মনে হয়, কাল নির্ণায়ক শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে কোনো সময়ে কাব্যটির রচনা বলে গবেষকদের অনুমান।

জীবিতকালেই বংশীদাসের কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি মনসা ভাসান গান গেয়ে বেড়াতেন। তার আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। তাঁর কন্যা পদ্মাবতী লিখেছেন,

ঘরে নাই ধান চাল, চালে নাই ছানি।
আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পানি।

কথিত আছে, বংশীদাস একবার নরহন্তা দস্যু কেনারামের হাতে পড়েছিলেন এবং তাঁর ভাসান গান শুনে দস্যু তার দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে।

বংশীদাসের কাব্য 'দেবখণ্ড' ও 'মানবখণ্ড' এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। কবির ইষ্টদেবতা শিব নন, চণ্ডী। চৈতন্য-পরবর্তী যুগের লক্ষণ কাব্যে স্পষ্ট। সাম্প্রদায়িক বিভেদের স্থলে সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে। দেবতাদের পারিবারিক কলহের ক্ষেত্রেও মানবিক আবেদন স্পষ্ট। চাঁদ সদাগরের চরিত্র পরিকল্পনাও অন্য মনসামঙ্গল থেকে ভিন্ন। কাব্যে চাঁদের দৃপ্ত পৌরুষ সুচিত্রিত। কবির পুরাণ জ্ঞান কাব্যে প্রকাশিত। কবি বৈষ্ণব হলেও শাক্তদেবীর বন্দনা করেছেন। অভেদ-কল্পনা তাঁর বৈশিষ্ট্য।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ—কেতকাদাস ক্ষমানন্দ মনসামঙ্গলের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' এতে ক্ষেমানন্দ ব্যতীত আর কোনো পদ্মাপুরাণের পুঁথির নাম করেন নি। সহজেই বোঝা যায়, আর কোনো কবির এতটা পরিচিতি ছিল না। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, পূর্ববঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। পূর্ববঙ্গে তাঁর কাব্য 'ক্ষেমানন্দী' নামে পরিচিত ছিল। মনসার আর একটি নাম 'কেতকা'—এজন্য তিনি কেতকাদাস। কবি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন এবং এক মুসলিম জমিদারের অধীনে তাঁর পিতা শঙ্কর দাস কাজ করতেন। পরে তাঁরা জমিদার ভারমল্ল খানের আশ্রয়ে এসে থাকেন। সেখানে খড় কাটার সময় এক মুচিনীকে প্রথমে দেখেন তারপর তাকেই সর্পভূষণা রূপে দেখেন। তিনি কেতকাদাসকে কাব্যরচনার আদেশ দেন। আত্মবিবরণীতে কাব্য-রচনাকালের কোনো উল্লেখ নেই, তবে বারা খাঁ নামে একজনের উল্লেখ

আছে এবং ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দেওয়া একটি দানপত্র পাওয়া গেছে। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবি বর্তমান ছিলেন। আত্মবিবরণীতে উল্লিখিত বিষ্ণু দাস ও ভারমল্ল খান ঐতিহাসিক ব্যক্তি। কাব্যটিতে বহু স্থানে চৈতন্যদেবের উল্লেখ আছে এবং কবি মুকুন্দরামের অনুসরণে বহু বর্ণনা আছে।

ক্ষেমানন্দের মতে মনসার জন্ম কেয়াপাতায়। 'কিআ পাতে জন্ম হৈল কেতকা সুন্দরী।' এই বর্ণনা আর কোনো কবির রচনায় পাওয়া যায় না। ক্ষেমানন্দের কাব্যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। তাঁর ভাষা সুপরিচ্ছন্ন ও বহুলাংশে পূর্বযুগের গ্রাম্যতা থেকে মুক্ত (ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য)। চরিত্রচিত্রণে খুব সার্থকতা না থাকলেও মনসার ক্রূর ভয়াল রূপের বর্ণনা সার্থক। কবির কাব্যে আরবী ফার্সি শব্দের ব্যবহারও লক্ষনীয়। ক্ষেমানন্দের চাঁদ সদাগর চরিত্রে দ্বিজ বংশীদাসের অনুকরণ আছে বলে গবেষকরা মনে করেছেন।

এই প্রধান রচয়িতারা ছাড়াও সপ্তদশ শতাব্দীতে বিষ্ণু পাল, ষষ্ঠীবর দত্ত, কালিদাস, সীতারাম দাস, জীবন মৈত্র ইত্যাদি কবিরা মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে শ্রীহট্ট জেলার কবি ষষ্ঠীবর দত্ত এখনও সেখানে জনপ্রিয়।

১৩.৫ সামগ্রিক বিশ্লেষণ

চৈতন্য-পূর্ব যুগের মনসামঙ্গল ও পরবর্তীকালের মনসামঙ্গলে মনসাচরিত্রের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ততটা লক্ষনীয় নয়। রুক্ষ, কঠোর স্বার্থপরায়ণ গূঢ় অভিসন্ধিযুক্ত বিদ্বেষ ভাবাপন্ন মনসা প্রায় একইরকম রয়ে গেছেন। হয়তো তাঁর অবহেলিত জীবনকে প্রকাশ করতে গিয়ে কবিরা তাঁর চরিত্রে এই কঠোরতা এনেছেন। তবু, ভাষা, রুচিবোধ ইত্যাদিতে চৈতন্য-পরবর্তী যুগের লক্ষণ বেশ কিছু খুঁজে পাওয়া যায়। কাহিনির প্রতি কৌতূহল আদ্যন্ত জীবিত করে রাখা মনসামঙ্গলের অন্যতম আকর্ষণ গল্প বলা বা গল্প শোনার চাহিদাও এতে পূরণ হয়েছে যা, লৌকিক অলৌকিকের বাধা না মেনে বহুকাল ধরে শ্রবণপিপাসু মানুষকে পরিতৃপ্ত করেছে। গল্পরস, নাটকীয়তা, মুহূর্মুহূ পটপরির্তন একে ভিন্ন মাত্র দিয়েছে।

মনসামঙ্গল কাব্যের প্রচার উভয় বাংলাতেই ছিল। অন্য কোনো মঙ্গলকাব্যে চাঁদ সদাগরের মত অনমনীয় মানবচরিত্র আর একটিও নেই। দুর্বল মেরুদণ্ডের বাঙালি জীবনের সাধারণ মাপকাঠিতে তৎকালীন যুগে এতটা প্রতিবাদী চরিত্র নিঃসন্দেহে কাহিনি-পরিকল্পনা ও কবিদের রচনাশক্তির ফসল। সনকার হাহাকার চিরকালীন মাতৃহৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। বেহুলার অন্তহীন সমুদ্রযাত্রা যা রূপকের রূপ নিয়েছে, এগুলি বাংলা সাহিত্যের চিরস্থায়ী সম্পদ। বাংলার জাতীয় কাব্য বলা না গেলেও এর বলিষ্ঠতা ও চাঁদ সদাগর চরিত্র অনুকরণীয়।

পূর্ববঙ্গে মনসামঙ্গলের প্রচার বেশি ছিল। রচনাকারের সংখ্যাও বেশি। রোগ, শোক, দুঃখ জর্জরিত বাঙালি-জীবনই মনসামঙ্গলে প্রতিফলিত। মনসামঙ্গল বৃহত্তর জীবন বা আধ্যাত্মিকতার কথা বলে না, ভক্তিরস বিহ্বলতার মদিরাও এতে নেই কিন্তু মানবীয় জীবনরস এর উপভোগ্যতার কারণ হয়ে উঠেছে।

একক : ১৪ ধর্মমঙ্গল কাব্য

১৪.১ কাব্য পরিচয়

বিষয়বস্তুর প্রাচীনত্বে এবং বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় প্রচেষ্টায় ধর্মমঙ্গল কাব্যের একটি আলাদা ঐতিহ্য আছে। মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গল ধর্মমঙ্গল কাব্যের আগেই শিল্পসম্মত কাব্যরূপ পেয়েছে। ধর্মমঙ্গলের ক্ষেত্রে এর

উপকরণের পুরোপুরি কাব্য হয়ে উঠতে আরও একশো বছর সময় লেগেছে।

ধর্মঠাকুরের পূজা রাঢ় অঞ্চলে অর্থাৎ ভাগীরথীর পশ্চিম তীর থেকে ছোটনাগপুর পর্যন্ত এখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এই লৌকিক দেবতা বিষয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর মতে ধর্মঠাকুরের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতা। পরবর্তীকালে এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'কূর্ম' শব্দট থেকে 'ধর্ম' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। ধর্মঠাকুরের কূর্মাকৃতি রূপও বহুস্থানে আছে। আবার বলা হয়েছে, ইনি জন্মসূত্রে বৈদিক দেবতা বরুণ। ধর্মঠাকুরকে সূর্য, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বরুণ, যম ইত্যাদি নানা দেবতারূপে কল্পনা করা হয়েছে।

ধর্মঠাকুরের মূল পূজক ডোমজাতি। এঁদের ধর্মের দেয়াসী বলা হয়। খ্রিস্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে এদের উল্লেখ করেছেন। পাল রাজাদের সময় থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রসার এবং সেন রাজাদের সময়েও এইসব অঞ্চল বৈদিক পরিমণ্ডল থেকে ভিন্ন থাকার জন্য নিজস্ব ধর্ম বিষয়ে এরা অনেক ভিন্ন ছিল। ধর্মপূজা মূলত নিম্নজাতির মধ্যে উদ্ভূত হয়ে পরে উচ্চবর্ণেও প্রভাব ফেলেছিল। বলা হয়—খ্রিস্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীতেও ব্রাহ্মণ কবি রূপরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল রচনা করার অপরাধে সমাজে পতিত হয়েছিলেন। বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান অঞ্চলে ধর্মঠাকুর এখনও সাড়ম্বরে পূজিত হন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি কূর্মাকৃতি পাথর, বা তিনটি পায়ার উপর বসানো পাথর পূজিত হয়, যাকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধ ত্রিশরণের প্রতীক বলেছেন, 'বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ ধর্মঠাকুরটি শালগ্রাম শিলার মত সুগোল তবে শালগ্রামের মত গায়ে কোনো ছিদ্র নাই। আসানসোলের নিকটবর্তী ডেমরা গ্রামের তিনটি ঠাকুরই ডিম্বাকৃতি।' (ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য)।

ধর্মঠাকুরকে নিয়ে রচিত কাব্য-সাহিত্য প্রধান দুইভাগে বিভক্ত। (১) ধর্মপূজা পদ্ধতি (২) ধর্মমঙ্গল কাব্য। রামাই পণ্ডিত ধর্মঠাকুরের পূজা পদ্ধতিও তাঁরই লেখা। লৌকিক ভাষায়, স্থূল লোকাচার—প্রধান এই পদ্ধতি—মন্ত্রগুলিও লৌকিক ভাষায় লেখা। ধর্মঠাকুর বন্ধ্যানারীকে সন্তান দেন, কুষ্ঠরোগ নিরাময় করেন এবং চক্ষুরোগও নিরাময় করে থাকেন। ধর্মঠাকুর পূজা আদায়ের লালসায় কোনো হীন উপায় বা ছলনার আশ্রয় নেননি সুতরাং দেবতা হিসাবে তাঁকে মোটামুটি নিরাসক্ত বলা যায়। এঁর পূজা পদ্ধতিও খুবই কঠোর। ফলাযুক্ত পাটার উপর গাড়গড়ি দেওয়া দেহের নয়টি স্থানে লোহার শলাকা ফোটানো, চড়কগাছে লোহার শলাকাবিদ্ধ অবস্থায় ঘোরা, ধর্মস্থান থেকে বিশেষ পুকুর পর্যন্ত 'ভক্ত্যার' গড়াতে গড়াতে যাওয়া—সবই ঠাকুরের কৃপালাভের প্রয়াস। রঞ্জাবতী কোলে ভর দিয়ে পুত্রলাভ করেছিলেন, লাউসেন নিজের মাথা ফেটে হোম করে দেবতার কৃপালাভ করেছিলেন।

ধর্মমঙ্গলের প্রধান কাহিনির নায়ক লাউসেন। তবে কোন কোনো হরিশ্চন্দ্রও তার স্ত্রী মদনার কথা বলা হয়েছে। কাহিনিটি আকারে দীর্ঘ—২৪টি পালায় বিভক্ত যা বারো দিন ধরে গীত হয়। কাহিনিটি এইরকম! গৌড়ের রাজার শ্যালক মন্ত্রী মহামদ পাত্র। কর্ণসেন ছিল গৌড়েশ্বরের একান্ত অনুগত। সে ত্রিষষ্ঠীর গড়ে পালিয়ে যায়। ইছাই ঘোষ তাকে পদচ্যুত করে রাজ্য অধিকার করে। স্বয়ং গৌড়েশ্বর ইছাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয় পুত্র ও স্ত্রী মারা যায়। গৌড়েশ্বর কর্ণসেনের দুঃখ দেখে শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে তার বিবাহ দেয়। মহামদ এতে ক্রুদ্ধ হয়। কর্ণসেনের আর কোনো সন্তান না হওয়ায় মহামদ রঞ্জাবতীকে বন্ধ্যা বলে উপহাস করে। রঞ্জাবতী হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী মদনার মত শালে ভর দিয়ে (লৌহশালাকার উপর ঝাঁপ দিয়ে) ধর্মঠাকুরকে সন্তুষ্ট করে পুত্র লাউসেনকে লাভ করে। মহামদ তাকে চুরি করে এবং ধর্মঠাকুর রঞ্জাবতীকে আর একটি পুত্র দেন, তার নাম কর্পূর সেন। হনুমান ধর্মের আদেশে লাউসেনকে উদ্ধার করে

মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেন। হনুমানই পুত্র দুটিকে শিক্ষা দান করেন।

লাউসেন বড় হয়ে অনেক প্রলোভন পার হয়ে গৌড়ে পৌঁছেই মহামদের চক্রান্তে কারারুদ্ধ হয়। দাদাকে ছেড়ে কর্পূর পালায়। ধর্মের কৃপায় লাউসেনের কারামুক্তি ঘটে। অলৌকিক শক্তি দেখিয়ে লাউসেন একটি তেজস্বী অশ্ব এবং কালু প্রভৃতি বারোজন ডোমকে সঙ্গী হিসাবে পায়। এবার লাউসেন কামরূপ জয় করে রাজকুমারী কলিঙ্গাকে বিবাহ করে। পথে মঙ্গলকোট ও বর্ধমানের রাজকন্যা অমলা ও বিমলাক বিবাহ করে। মহামদের চক্রান্তে গৌড়েশ্বর সিমুলার রাজকন্যা কানাড়াকে বিবাহ করতে চায়। রাজা বৃদ্ধ বলে রাজকন্যা বিবাহে রাজি হয় না। কানাড়া যুদ্ধের প্রস্তাব দেয় এবং আগেই একটা 'লৌহ গণ্ডা' এনে দুভাগ করতে বলে। লাউসেন অনায়াসে সেটি দু-ভাগ করে এবং কানাড়াকে বিবাহ করে। এরপর ইছাই ঘোষের সঙ্গে লাউসেনের যুদ্ধ হয়। ইছাই-এর রথে পার্বতী এবং লাউসেনের রথে ধর্মঠাকুর থেকে যুদ্ধ করেন। কালুডোম এই যুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব দেখায়।

এরপর গৌড়েশ্বর আয়োজিত ধর্মপূজায় ত্রুটির কারণে রাজ্যে প্রবল ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়। লাউসেন পাপ দূর করতে 'হাকন্দ' যায়—যাতে সূর্য পশ্চিমে উদিত হন। ইতিমধ্যে মহামদ লাউসেনের রাজ্য আক্রমণ করে। কালু ডোমের পত্নী লখাই ডোমনী এবং রানি কানাড়ার অসামান্য বীরত্বে মহামদ পরাস্ত হয়। এই যুদ্ধে কালু ডোম মারা যায়।

অবশেষে লাউসেন মাথা ফেটে হোম করলে ধর্ম প্রসন্ন হন এবং সূর্য পশ্চিমে উদিত হয়। শাস্তি হিসাবে ধর্ম মহামদকে কুষ্ঠরোগ গ্রস্ত করেন। লাউসেনের প্রার্থনায় তার রোগমুক্তি ঘটে কিন্তু একটি দাগ থেকে যায়। লাউসেন সশরীরে স্বর্গারোহণ করে।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনি যুদ্ধের বর্ণনায় পূর্ণ। শিল্প রচনার স্থান এখানে স্বল্প। বিশেষত ডোমদের বীরত্ব এর উপভোগ্য বিষয়। কাহিনির পাত্রপাত্রী ঐতিহাসিক না হলেও বহু ঐতিহাসিক স্থানের উল্লেখ এই কাব্যে আছে।

১৪.২ ধর্মমঙ্গলের কবি

ময়ূর ভট্ট—ধর্মমঙ্গলের প্রথম কবি হিসাবে ময়ূর ভট্টের নামই গবেষকরা করেছেন। এঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না তবে, ধর্মমঙ্গলের বহু কবি এঁর সম্পর্কে কথা বলেছেন যেমন, রূপরাম, মানিক গাঙ্গুলী, খেলারাম চক্রবর্তী, গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, সীতারাম দাস প্রমুখ। ধর্মমঙ্গলের সব কবিই ময়ূর ভট্টের কাছে তাঁদের কাব্যের উপাদান গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের কাব্যে ময়ূর ভট্টের প্রভাব আছে। ঘনরাম উল্লেখ করেছেন যে, ময়ূর ভট্টের কাব্যের নাম 'হাকন্দ পুরাণ'—

'হাকন্দ পুরাণে লেখা সাক্ষাৎ আমার দেখা
কলিকালে পশ্চিম উদয়।'

লাউসেন যেখানে দেহ নয় খণ্ড করে কেটেছিল, সেই স্থানেরই নাম 'হাকন্দ'। এসবের কোনো প্রামাণিকতা নেই। হয়তো ময়ূর ভট্ট অন্য কবির রচনার মধ্যেই লুকিয়ে আছেন।

আদি রূপরাম—মানিক গাঙ্গুলীর কাব্যেই এঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বতন্ত্রভাবে এঁর কোনো পরিচয় উদ্ধার করা যায় নি।

খেলারাম—গ্রন্থ রচনার কালজ্ঞাপক পদটি থেকে মনে করা হয়, ইনি এই ধারার প্রাচীন কবি। মোটামুটি ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে ইনি গ্রন্থরচনা করেন বলে ধরা হয়েছে।

শ্যাম পণ্ডিত—বীরভূম অঞ্চলের কবি। এঁর কাব্যের নাম 'নিরঞ্জন মঙ্গল'। ড. সুকুমার সেন এঁকে সপ্তদশ

শতাব্দীর মধ্যভাগের কবি বলতে চেয়েছেন। সম্ভবত ইনি ডোমেদের ব্রাহ্মণ ছিলেন, আবার বলা হয়েছে, ইনি বণিক জাতীয়ও হতে পারেন।

মানিকরাম গাঙ্গুলী—ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ মানিকরাম গাঙ্গুলীকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের কবি বলেছেন। যোগেশচন্দর বিদ্যানিধির মতে এঁর কাব্যের রচনাকাল ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ। অন্যদের মতে ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দ। গ্রন্থের ভাষা বিচারেও এটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের রচনা বলে মনে হয়। মানিক গাঙ্গুলীর পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গেছে। একটি বৃদ্ধের রূপ ধরে বাঁকুড়া রায় তাঁকে ধর্মমঙ্গল রচনার আদেশ দেন। এই কাব্যে প্রথমে ২৪টি পালায় দেবতত্ত্ব ও পরে ২৩টি পালায় লাউসেনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। ইনি একজন সুকবি এবং সুপণ্ডিত। চরিত্রচিত্রণে এবং বিশেষত বীররসের বর্ণনায় দক্ষ। নানা অলংকারের সমাবেশ ও বাংলা ছন্দের বৈচিত্র তাঁর কাব্যে আছে। আদিরসের বর্ণনা থেকে তাঁর সংস্কৃত রসশাস্ত্রের জ্ঞান সম্পর্কে বোঝা যায়। 'লখ্যা ডোমনীর চরিত্র তাঁর কাব্যের এক অতি অপূর্ব সৃষ্টি।' (আশুতোষ ভট্টাচার্য)

রূপরাম চক্রবর্তী—ড. সুকুমার সেনের মতে রূপরাম চক্রবর্তী ১৬৪৯-৫০ খ্রিস্টাব্দে কাব্যরচনা করেন। রূপরামের জন্মস্থান ছিল বর্ধমান জেলার শ্রীরামপুর গ্রামে। বাড়ি থেকে পালিয়ে পথিমধ্যে ধর্মঠাকুর কর্তৃক কাব্যরচনার আদেশ পান। রাজা গণেশ কবিকে চামর মন্দিরা উপহার দিয়ে গানের দল বেঁধে দেন। তখন থেকে তিনি ধর্মের আসরে গান গাইতে শুরু করেন। এই কারণে সম্ভবত তাঁকে সমাজে পতিত হতে হয়। মানিক গাঙ্গুলীর রচনার সঙ্গে তাঁর রনার প্রভূত মিল লক্ষ করা যায়।

পাঠ শেষ না করলেও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। আত্মবিবরণী ও অন্যত্র সহজ সরল মর্মস্পর্শী ভাষার প্রয়োগ লক্ষিত হয়। তিনিই প্রথম লাউসেনের কাহিনিকে ব্রত, ছড়া, পাঁচালির থেকে মুক্তি দিয়ে সম্পূর্ণভাবে কাব্যিকতা-খণ্ডিত করে তোলেন।

রামদাস আদক—এঁর কাব্যের নাম 'অনাদিমঙ্গল'। কবি জাতিতে কৈবর্ত, বাড়ি হুগলি জেলার হায়ৎপুর গ্রামে। মাতুলালয়ে যাওয়ার পথে সিপাহী কর্তৃক ধৃত ও অত্যাচারিত হন। দীঘির ধারে জলপান করতে গেলে দীঘি শুষ্ক হয়ে যায়, তখন এক দিব্যপুরুষ তাঁকে জলপান করান এবং কাব্য রচনার আদেশ দেন। এঁর গ্রন্থের রচনাকাল ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দ।

কবির ভাষা পরিচ্ছন্ন ও সরল। ভাষায় পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর না থাকলেও অলংকরণ, শব্দযোজনা, রূপনির্মাণে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

সীতারাম দাস—সীতারাম দাসের কাব্যরচনার কাল ১৬৯৮ বলে গবেষকরা মনে করেন। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস গ্রামে তাঁর জন্ম। কবিরা জাতিতে কায়স্থ। পিতার নাম দেবী দাস, মাতা কেশবতী? 'গজলক্ষ্মী মা'-এর স্বপ্নাদেশে ইনি কাব্য রচনা করেন অবশ্য ধর্মও তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন। ময়ূরভট্টের কাব্য এই কবির আদর্শ ছিল। সীতারামের রচনা বিবৃতিধর্মী ও সরল। কবি হিসাবে তাঁকে খুব উচ্চস্তরের বলা যায় না তবে, চরিত্রচিত্রণ নৈপুণ্য ও ঘটনাবৈচিত্র্য তাঁর কাব্যের গুণ।

ঘনরাম চক্রবর্তী—ঘনরাম চক্রবর্তী মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি। ১৬৬৩ শকাব্দ বা ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কাব্য সমাপ্ত হয়। বর্ধমান জেলার কইয়ড় পরগনার কৃষ্ণপুর গ্রামে কবির জন্ম। ঘনরামের পিতার নাম গৌরাকান্ত, মাতা সীতা। পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি 'কবিরত্ন' উপাধি পেয়েছিলেন। বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কের কথা তিনি স্পষ্ট করে বলেননি। তবে তিনি হয়তো রাজার দ্বারা উপকৃত হন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তাই রাজার কল্যাণ কামনা করে বলেছেন,

চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি

দ্বিজ ঘনরাম রস গান।

ধনরামের রচনায় কোনো স্বপ্নাদেশের কথা নেই। তবে তিনি এ বিষয়ে তাঁর গুরুর কথা বলেছেন। তাঁর গুরুই তাঁকে উপাধি দেন।

চব্বিশ অধ্যায়ে ঘনরাম ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। ড. সুকুমার সেন বলেছেন, 'ধর্মমঙ্গল-রচয়িতাদের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত ও দক্ষ ছিলেন ঘনরাম চক্রবর্তী। ঘনরাম সুলেখক ছিলেন। তাঁহার রচনা সর্বাধিক পরিচিত ধর্মমঙ্গল কাব্য।' কবি কাব্যরচনার অবকাশে পুরানের নানা বর্ণনা দিয়েছেন যা অনেক সময় অর্থবোধে অসুবিধা সৃষ্টি করে। অলংকরণের ক্ষেত্রে পরবর্তী কবি ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যায়। সহজ অনুপ্রাস তাঁর কাব্যকে শ্রুতিমধুর করেছে। কবির ভাষা অত্যন্ত মার্জিত। তাঁর সামাজিক অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। লখাই ডোমনী, তার সপত্নী সনকা, লাউসেন, কর্পূরসেন ইত্যাদি জীবন্ত চরিত্র। শোকের ক্ষেত্রে সংযম দেখিয়েছেন ঘনরাম—যুদ্ধের বাতাবরণে শোকের অবকাশ যে কত কম তা তাঁর রচনায় স্পষ্ট। তাঁর রচিত স্ত্রী চরিত্র পুরুষ চরিত্রের চেয়ে অনেক জীবন্ত। মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিকতা থেকে এই বীরত্বগাথা এক বিপরীত ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্য আরও বহুকবি রচনা করেছেন। যেমন, যদুরাম, রাজারাম দাস, প্রভুরাম, গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনারায়ণ, রমাকান্ত রায় ইত্যাদি।

১৪.৩ সামগ্রিক বিশ্লেষণ

অনেকে ধর্মমঙ্গল কাব্যধারাকে রাঢ়ের জাতীয় কাব্য বলে আখ্যা দিতে চেয়েছেন। ধর্মপূজা ও কাব্যরচনার ক্ষেত্র সীমিত। সারা বাংলাব্যাপী এর প্রচলন নেই। রাঢ়ভূমির যে স্বতন্ত্র ভৌগোলিক অবস্থান, রুক্ষ, কঠোর জীবনচর্যা, নিম্নশ্রেণীর বিচরণের ক্ষেত্র, তা ধর্মমঙ্গলকে ভিন্ন উপাদানে গঠিত করেছে। প্রকৃত যুদ্ধের কথা এবং যুদ্ধে পারদর্শী ডোমদের কথা একমাত্র ধর্মমঙ্গলেই আছে। বাঙালির কেন্দ্রীয় সংস্কৃতির সঙ্গে রাঢ়ের সংস্কৃতির ভিন্নতা থাকায় এবং কঠোর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়ার দৈবশক্তির চেয়ে নিজের বাহুবলের উপর এই অঞ্চলের অধিবাসীদের ভরসা বেশি ছিল। বীরভূম 'মল্লভূম', 'শূরভূম' এই নামের মধ্যে এদের শৌর্যবীর্যের পরিচয় লুকানো আছে।

বৌদ্ধধর্মের শেষ যুগে বৌদ্ধধর্মে হিন্দু পূজাবিধি ও হিন্দুধর্মে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার সংশ্লেষ ঘটেছে তখনকার সেই পূজা-উপাদানের ইতিহাস আছে ধর্মঠাকুরের পূজায়। জটিল আভিচারিক ক্রিয়ার সাহায্যে অলৌকিক ফললাভ এই পূজার উদ্দিষ্ট। এই ধর্মঠাকুর কিন্তু মনসা বা চণ্ডীর মত পূজা-লালসায় কিছু করেননি। ভক্তরাই তাঁকে তুষ্ট করার জন্য নানা আভিচারিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। ভক্তকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা তিনি কোনভাবেই করেননি। মূলত নিম্নশ্রেণী, যারা হিন্দুসমাজের উপেক্ষিত তাদের মধ্য থেকে উঠে এই দেবতা বহুকাল পরে হিন্দুধর্মে এসেছেন। হিন্দুধর্মের মূল ধারায় গৃহীত না হলেও নিম্নশ্রেণীর পূজা অনুষ্ঠানে ইনি এখনও বিরাজমান এবং বর্তমানে বেশ কিছু মানুষের কৌতূহলের কেন্দ্র।

উল্লেখযোগ্য কবির স্পর্শে না আসায় ধর্মমঙ্গলকাব্য কাব্য হিসাবে ম্লান। তবে কালু ডোম, লখা ডোমনী, কানাড়া ইত্যাদি চরিত্রের বীরত্ব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধর্মমঙ্গলকাব্য করুণরসের কাব্য নয়। নারীরা এখানে ক্রন্দন করে কালক্ষেপ করেনি, যুদ্ধ করে প্রতিশোধ নিয়েছে। লাউসেনর বীরত্বের পাশে কর্পূর সেনের ভীরুতা, মানবাতর দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। একটি নিম্নশ্রেণীর সমাজ, বিশেষ কাল, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এই কাব্যে জীবন্ত রূপ লাভ করেছে।

১৪.৪ সংক্ষিপ্তসার

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত এইসব মঙ্গলকাব্যে মনসা ও ধর্মঠাকুরের কথা ব্যক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের নানাস্থানে বহু মনসামঙ্গল কাব্য পাওয়া গেছে। মনসামঙ্গলে কাহিনিগত কিছু পার্থক্য থাকলেও তা মোটামুটি একই—দেবখণ্ড ও নরখণ্ডে তা দেখা যায়। চাঁদ সদাগর-বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনি অবলম্বনে মনসামঙ্গল আখ্যানকাব্য রচিত। নাম 'পদ্মাপুরাণ'। বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, বিপ্রদাস পিপিলাই, দ্বিজ বংশীদাস, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ছাড়াও আরও অনেক কবি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন। গল্পরস, নাটকীয়তা, প্রতি মুহূর্তে পটপরিবর্তন মনসামঙ্গলকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। বাঙালি জীবনের ওপর এই কাব্যের প্রভাব অপরিসীম।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের একটা আলাদা ঐতিহ্য আছে। ধর্মঠাকুরের পূজা রাঢ় অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ধর্মঠাকুর লৌকিক দেবতা। জন্মসূত্রে অবশ্য বৈদিক দেবতা বরুণ। একে সূর্য, বিষ্ণু, ইন্দ্র, যম ইত্যাদি নানা দেবতারূপেও কল্পনা করা হয়েছে। ধর্মঠাকুরের মূল পূজক ডোমজাতি। রামাইপণ্ডিত ধর্মঠাকুরের আদি পুরোহিত। কাব্যের কাহিনি দুটি—একটা ধর্মঠাকুরের পূজা পদ্ধতি, আরেকটা ধর্মমঙ্গল কাব্য। ধর্মমঙ্গলের প্রধান কাহিনির নায়ক লাউসেন। এই কাব্যের কাহিনি যুদ্ধের বর্ণনায় পূর্ণ। কাহিনির পাত্র-পাত্রী ঐতিহাসিক না হলেও এই কাব্যে বহু ঐতিহাসিক স্থানের উল্লেখ আছে। ময়ূরভট্ট, খেলারাম, মানিকরাম গাঙ্গুলী, রূপরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী প্রমুখ কবি এই কাব্যকে গতানুগতিকতা মুক্ত করে এক বিপরীত ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন। অনেকে ধর্মমঙ্গলকে রাঢ়ের জাতীয় কাব্য বলে আখ্যা দিতে চেয়েছেন।

একক ১৫-১৬ ❐ চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল

গঠন

১৫-১৬.১ উদ্দেশ্য
১৫.২ প্রস্তাবনা
১৫.৩ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য
১৫.৪ চণ্ডীমঙ্গলের কবি
১৫.৫ সামগ্রিক বিশ্লেষণ
১৬.১ কবিজীবন
১৬.২ কাব্য কাহিনি
১৬.৩ ভারতচন্দ্রের কবিত্ব শক্তি
১৬.৪ সামগ্রিক বিশ্লেষণ
১৬.৫ সংক্ষিপ্তসার
১৬.৬ অনুশীলনী

১৫-১৬.১ উদ্দেশ্য

মঙ্গলকাব্য ধারার অন্য দুই বিশিষ্ট কাব্য চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল। এই দুই কাব্য রচনার বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক কারণ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা এই একক থেকে পাওয়া যাবে। দুটি মঙ্গলকাব্যের কাহিনি এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিশিষ্ট কবিদের পরিচয় এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কাব্য দুটির সমাজচিত্র, কাব্য রচনার ধর্মীয় ও সাহিত্যিক কারণ, রাজনৈতিক পটভূমি, পুরাণের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির মেলবন্ধন ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য শিক্ষার্থীকে জানানো এই এককের উদ্দেশ্য।

১৫.২ প্রস্তাবনা

মধ্যযুগের অন্যতম কাব্য চণ্ডীমঙ্গল। তুর্কী বিজয়ের বিপর্যয়ের ফল স্বরূপ এর সৃষ্টি। চণ্ডী ও পার্বতীর মিলন ঘটেছে এখানে। তবে অনার্য চণ্ডী ব্যাধজীবনের সঙ্গে যুক্ত। এর ফলে অনার্য দেব-দেবীরা সমাজে সমাদর পেতে শুরু করে। কালকেতু ও ফুল্লরা এখানে জীবন্ত রূপ লাভ করেছে। চণ্ডীদেবী অনার্য হলেও উচ্চসমাজে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি ভারতচন্দ্র রায়ের স্মরণীয় কাব্য 'অন্নদামঙ্গল'। প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে ভারতচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে নতুন দিগন্তের নির্দেশ করেন। অবক্ষয়ী যুগে তাঁর সৃষ্টি বুদ্ধিদীপ্ত রূপ দিতে পেরেছে। বাংলাদেশের বাস্তব জীবনচিত্র এইসব মঙ্গলকাব্যগুলিকে সমৃদ্ধ করেছে।

১৫.৩ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

বাংলায় চণ্ডীপূজার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। উল্লেখ্য, চৈতন্য ভাগবত—'মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।' দেবী চণ্ডী এবং চণ্ডীপূজার প্রচলন ব্যাপারে বহু তথ্য বহু গবেষক দিয়েছেন। এগুলির ব্রত, নিয়ম ইত্যাদি বেশ জটিল। কেউ মনে করেন, চণ্ডী ব্রাহ্মণ্য ও পৌরাণিক সংস্কৃতি থেকে জাত, কেউ বা এর মূলে বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবতার প্রভাব দেখেছেন। হিন্দুদের দশমহাবিদ্যা বৌদ্ধদের কাছে উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা ইত্যাদি দেবী। পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের শক্তিও পাঁচটি দেবী। মহাভারতের যুগে দেবীদুর্গা, বিন্ধ্যবাসিনী ও মহিষাসুর-বিনাশিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। দেবীর নামের বিকল্প হিসাবে কুমারী, কালু, কপালী, মহাকালী, চণ্ডী, কান্তারবাসিনী ইত্যাদি নামও মহাভারতে আছে। প্রাচীন দুর্গামূর্তিগুলিতে অনেক স্থানে দুর্গা ও চণ্ডীর একীকৃত রূপ দেখা যায়। পায়ের তলায় অথবা হাতে দেবী গোধিকা ধারণ করে আছেন এমন মূর্তিও পাওয়া গেছে। খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দীর আগে থেকে বাংলা দেশে দুর্গা ও চণ্ডীপূজা একীকৃত হয়েছে।

'চণ্ডী শব্দটির উৎস অনার্য, যা পরে সংস্কৃতায়িত হয়েছে। ছোটনাগপুরের ওঁরাও নামক উপজাতির মধ্যে চাণ্ডী নামে এক শক্তিদেবীর পূজা প্রচলিত। ইনি শিকারের এবং বিশেষভাবে অবিবাহিত যুবকদের দেবতা। চাণ্ডী থেকে চণ্ডীর উৎপত্তি সম্ভব। প্রাচীন পুরাণে দুর্গা, উমা, কালিকা ইত্যাদি নাম পাওয়া গেলেও এই নামটি পাওয়া যায়নি। এমনকি 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে'ও নামটি নেই। আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তীকালে রচিত কয়েকটি পুরাণে চণ্ডী বা চণ্ডিকার নাম আছে। যেমন দেবী ভাগবত, 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ', 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ' হরিবংশ ইত্যাদিতে। এটি স্পষ্ট, এই দেবী অনার্য সমাজ থেকে ক্রমে উচ্চতর সমাজে উন্নীত হয়েছেন। কেউ কেউ বাশুলী বা গজ লক্ষ্মীকেও চণ্ডীর রূপ বলেছেন। অনেকে মনে করেন বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী বজ্রতারা পরে মঙ্গলচণ্ডীতে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু এই মত সকলে গ্রহণ করেননি।

চণ্ডীর সঙ্গে মঙ্গল শব্দটির যোগ নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' বলা হয়েছে 'মঙ্গলেষু চ যা দক্ষ। সা চ 'মঙ্গলচণ্ডিকা'। যাইহোক, মঙ্গলচণ্ডী মহিলাদের পূজিত দেবী, ঘটে পটে এঁর পূজা হয়। ইনি অবশ্যই শুভ এবং মঙ্গল করেন। চণ্ডীর পূজা প্রচারের ক্ষেত্রে মেয়েদের আচরিত ব্রতকথা ও অনুষ্ঠানের অবদানের কথা অস্বীকার করা যায় না।

চণ্ডীমঙ্গলের দুটি কাহিনি 'আখেটিক খণ্ড' বা 'বণিক খণ্ড'—কেন এই দুটি পৃথক কাহিনি একত্রিত হল এর কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা নেই। প্রথমটি ব্যাধ কালকেতুর এবং দ্বিতীয়টি বণিক ধনপতির উপাখ্যান।

'আখেটিক' খণ্ডের পূর্বে যথারীতি 'দেবখণ্ড'—যেখানে হর-পার্বতীর গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র ও চণ্ডীর পূজা প্রচারের চেষ্টার কথা আছে। এখানে ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে কৌশলে শাপ দিয়ে মর্তে পাঠানো হল। নীলাম্বরও তার পত্নী ছায়া কালকেতু ও ফুল্লরা রূপে মর্তে বেদের ঘরে জন্ম নিল। কালকেতুর সঙ্গে ফুল্লরার বিবাহ হল। কালকেতু শিকার করে ও ফুল্লরা হাটে সেই মাংস বিক্রয় করে—তাদের সাংসারিক জীবন খুব কষ্টেই কাটে একদিন চণ্ডীর ছলনায় কালকেতু একটিও পশু শিকার করতে পারল না—যাওয়ার পথে সে একটি গোধিকা দেখেছিল, তাকেই জালে বন্দী করে ঘরে নিয়ে এল। কালকেতু হাটে গেলে গোকারূপিনী চণ্ডী রূপসী নারীরূপে ফুল্লরার সামনে দেখা দিলেন। ফুল্লরা এই নারী তার সপত্নী হতে পারে ভেবে তাকে অনেক দুঃখের কথা জানায় এবং সেই নারী তবুও চলে না গেলে সে কালকেতুর কাছে হাটে গিয়ে সব বলে। কালকেতু ঘরে ফিরে সেই নারীকে দেখে কাটতে গেলে তিনি স্বমূর্তি ধারণ করেন এবং সাতখড়া ধন দিয়ে কালকেতুকে গুজরাটে নগর

পত্তন করতে বলেন। কালকেতু গুজরাটে নগর পত্তন করল। ভাঁড়ুদত্ত নামক খল চরিত্রকে তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিলে সে কলিঙ্গরাজের কাছে গিয়ে তাকে কালকেতুর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করে। কলিঙ্গরাজ কালকেতুকে যুদ্ধে পরাজিত করে বন্দী করে। কালকেতুর প্রার্থনায় চণ্ডী কলিঙ্গরাজের রাজ্যে প্রবল বন্যা সৃষ্টি করলেন এবং রাজাকে স্বপ্নাদেশ দিলেন কালকেতুকে সব ফিরিয়ে দেওয়া জন্য। কালকেতু মুক্তি পেল—চণ্ডীর পূজা প্রচারিত হল। পুত্র, পুষ্পকেতুকে রাজ্য দিয়ে কালকেতু-ফুল্লরা স্বর্গে গমন করল।

বণিক সমাজের প্রধান ধনপতি এই খণ্ডের নায়ক। সে শৈব। এই বণিককে দিয়ে চণ্ডীর পূজা করাতে পারলে তা সর্বজনগ্রাহ্য হবে। ধনপতির প্রথমা পত্নী লহনা, সে বন্ধ্যা। লহনার খড়তুতো বোন খুল্লনার রূপে মুগ্ধ হয়ে ধনপতি খুল্লনাকে বিবাহ করে। এরপর গৌড়ের রাজা কার্যোপলক্ষে ধনপতিকে বিদেশে পাঠায়। ইতিমধ্যে দুই সপত্নীর মধ্যে দুর্বলা দাসী কলহ সৃষ্টি করে এবং লহনা খুল্লনাকে বনে ছাগল চরাতে পাঠায়। সেখানে বন্যরমণীদের মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করতে দেখে সেও মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করে। চণ্ডী প্রসন্ন হয়ে লহনাকে আদেশ দেন খুল্লনাকে ফিরিয়ে নিতে। লহনা খুল্লনাকে ঘরে এনে আবার আদর যত্নে রাখতে শুরু করে। ধনপতি 'অসঙ্গত সুখে' মগ্ন থেকে বাড়ির কথা ভুলে ছিল। চণ্ডী স্বপ্নাদেশ দিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনলেন। খুল্লনা বনে ছাগল চরাত বলে তার সতীত্বের অনেক পরীক্ষা নেওয়া হল। চণ্ডীর কৃপায় খুল্লনার সব কিছুতেই জয় হল।

এরপর ধনপতি গৌড়েশ্বরের আদেশে সিংহলে বাণিজ্যযাত্রা করল—খুল্লনা তখন সন্তানসম্ভবা। স্বামীর কল্যাণে খুল্লনা মঙ্গলচণ্ডীর পূজার আয়োজন করল, কিন্তু শৈব ধনপতি চণ্ডীর পূজা না করে চণ্ডীর ঘট পদাঘাতে ভেঙে দিল। এরপর সে বাণিজ্যযাত্রা করলে সমুদ্রের মধ্যে ঝড়ে তার তরীগুলি ডুবে যায় এবং কালীদহে কমলের উপর অধিষ্ঠাতা এক অপরূপা রমণীকে সে একটি হস্তীকে গ্রাস এবং উদ্‌গীরণ করতে দেখে। কোনোরকমে সিংহলে পৌঁছে সে রাজাকে এই কাহিনি বললে রাজা তাকে এই দৃশ্য দেখাতে বলে। ধনপতি তা দেখাতে না পারায় কারারুদ্ধ হয়।

ইতিমধ্যে খুল্লনার সন্তান শ্রীমন্তর জন্ম হয় সে বড় হয়ে পিতার সন্ধানে সিংহলে গেল এবং অনুরূপ দৃশ্য দেখে রাজাকে বললে রাজা তাকে এই দৃশ্য দেখাতে বলল। দেখাতে পারলে রাজা তার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেবে, অন্যথায় তার শিরচ্ছেদ করবে। 'কমলে' কামিনী দেখাতে না পারায় শ্রীমন্তকে মশানে নিয়ে যাওয়া হল। সে চণ্ডীর স্তব করে দেবীকে তুষ্ট করল। দেবীর ভূজপ্রতি যুদ্ধ করে রাজার সৈন্যদের হারিয়ে দিল। এবার সিংহলরাজ 'কমলে কামিনী' দর্শন করতে পারল। পথে উজানি নগরের রাজাকেও ঐ কমলে-কামিনী রূপ দেখিয়ে শ্রীমন্ত তার কন্যাকে বিবাহ করল। শাপভ্রষ্ট দেবদেবীরা সবাই স্বর্গে ফিরে গেল।

মনসামঙ্গল কাব্য রচনার ক্ষেত্রে যেমন একই কাহিনি প্রচারিত হয়েছিল, চণ্ডীমঙ্গলে তা হয়নি। রাঢ়, বারেন্দ্র এবং বঙ্গ এই সবকটি জায়গায় কিছু কাহিনিগত ভিন্নতা দেখা যায়। যে কবিদের প্রচেষ্টায় মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত থেকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার জন্ম সম্ভব হল, তাঁরা হলেন, মানিক দত্ত, দ্বিজ মাধব, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। পরে কয়েকটি নাম পাওয়া গেলেও কাব্যের বিচারে তারা গৌণ।

১৫.৪ চণ্ডীমঙ্গলের কবি

মানিক দত্ত—মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মানিক দত্ত সম্পর্কে শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছেন,

মানিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।

যাহা হৈতে হৈল গীতপথ পরিচয়।।

কাজেই, মানিক দত্ত চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবি। কিন্তু তিনি ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে কাব্য রচনা করেন নি। যে পূর্ণাঙ্গ পুঁথি পাওয়া গেছে তাতে উল্লেখ আছে—

আইল ফিরিঙ্গি সব বসিল একত্তরে।

আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে পুঁথিটি ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে অনুলিখিত হয়েছিল এবং এর একশো বছর আগে হয়তো এটি রচিত। পুঁথিতে ধর্মমঙ্গলের মত করে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। ধনপতির কাহিনিটি মুকুন্দরামের চেয়ে সুপরিকল্পিত। অনুমিত হয়, ইনি প্রাচীন গৌড় বা মালদহ জেলার লোক ছিলেন। এই কবির পরিচিত খুবই সীমাবদ্ধ ছিল বলে গবেষকরা মনে করেছেন।

দ্বিজ মাধব—দ্বিজ মাধবের পুঁথি ও ব্রতকথা নিয়ে ছোট ছোট পালাগান উত্তরবঙ্গে ও চট্টগ্রামের সুপরিচিত। বরং ঐ সব স্থানে মুকুন্দরাম এত বিখ্যাত নন। পশ্চিমবঙ্গ দ্বিজ মাধবের পরিচিত কম। দ্বিজ মাধবের কাব্যের নাম 'সারদাচরিত' বা 'সারদামঙ্গল'। তাঁর সমস্ত পুঁথিতে কাব্যরচনার কাল ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দ। ধরে নেওয়া যায় মুকুন্দরামের পূর্বে তিনি কাব্যরচনা করেছিলেন। কবির জন্মস্থান সপ্তগ্রাম অথবা নবদ্বীপ তা স্থির করা যায় নি। তিনি বলেছেন, তাঁর পিতার নাম পরাশর। মনে করা হয়েছে, মোগল-পাঠান দ্বন্দ্বের সময় তাঁর পরিবার পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চট্টগ্রামের দিকে চলে গিয়েছিল। 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' রচয়িতা মাধব আচার্য থেকে দ্বিজ মাধব ভিন্ন। তবে তাঁর সঙ্গে যুক্ত করেও অনেকে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিজ মাধব 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী'র অনুসরণে দেবখণ্ডে মঙ্গলাসুরের বিনাশ দেখিয়েছেন। এইটি অন্য চণ্ডীমঙ্গলে নেই। কালকেতুর কাহিনি খুবই সংক্ষিপ্ত। যেমন ব্রতকথা বা পালাগান হয়, তেমন। একমাত্র ভাঁড়ু দত্ত ছাড়া আর কোনো চরিত্রের ক্ষেত্রে কবির নৈপুণ্য প্রকাশিত হয় নি। তাঁর রচিত লহনা-খুল্লনা চরিত্রও স্পষ্ট নয়। সুশীলার বারমাস্যা গতানুগতিক হলেও অনলঙ্কৃত, সহজ, প্রাণের কথা।

দ্বিজমাধব উচ্চশ্রেণীর কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন না। সৃষ্টিনৈপুণ্যের অভাব মেনে নিয়েও বলা যায়, তিনি যে অনেকগুলি বিষ্ণুপদ কাব্যে সংযোজন করেছেন, তা তাঁর ভক্তিপ্রবণ মনের কথা।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী—মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। তিনি তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ হিসাবে যে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন, তা বহুভাবে আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থরচনার কাল হিসাবে ড. সুকুমার সেন মনে করেন, ১৫৯১-৯২ খ্রিস্টাব্দ তাঁর কাব্যরচনার শেষ সীমা। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যর মতে '১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে কোনো সময়ে এই কাব্য-রচনা সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।' ড. ক্ষুদিরাম দাসের মতে '১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে তিনি কাব্যরচনায় হাত দেন নি। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে মুকুন্দরাম ১৫৯০-৯১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সমাপ্ত করেন।' এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে মুকন্দরাম ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁর কাব্যরচনা করেন।

আত্মবিবরণী থেকে দেখা যায়, কয়েক পুরুষ ধরে মুকন্দরামের পরিবার বর্ধমান জেলার দামিন্যা গ্রামে বসবাস করতেন। তাঁরা ছিলেন কৃষিজীবী। কবিরা শৈব হলেও তাঁর পিতামহ বৈষ্ণব মতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা পুরুষানুক্রমে গোপীনাথ নন্দীর জমি ভোগ করতেন। সেই সময় রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে কবি সপরিবারে দামিন্যা ত্যাগ করলেন। পথে অত্যন্ত দুঃখকষ্ট ভোগ করলেন। সঙ্গে যে অর্থ ছিল তা ডাকাত কেড়ে নিল। মুড়াই নদী পার হয়ে তাঁরা ডেঙুটিয়া গ্রাম ছেড়ে, দারুকেশ্বর, নারায়ণ, পরাশর, আমোদর নদী পার হয়ে কুচুট্যা নামক স্থানে এলেন। মুকন্দরাম বলছেন সেখানে,

তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান করিলুঁ উদক পান
শিশু কাঁদে ওদনের তরে।

এখানে শালুক পোড়া ও শালুক ফুল দিয়ে চণ্ডীর পূজা করে নিদ্রা গেলে দেবী চণ্ডীর কাছে কবি কাব্যরচনার নির্দেশ পেলেন। পরে আরড়া নগরে গিয়ে কবি জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় পেলেন এবং বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায়ের শিক্ষক নিযুক্ত হলেন এবং তার বেশ কিছু পরে 'চণ্ডীমঙ্গল' বা 'অভয়ামঙ্গল' কাব্য রচনা করলেন।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের রচনা দুটি পৃথক আখ্যায়িকা নিয়ে সম্পূর্ণ। উপাদানেরর দিক থেকে দেখলে কাহিনি দুটি পৃথক স্তরের। একটিতে সমাজের সবচেয়ে নিচুস্তরের অন্ত্যজ ও দরিদ্র শ্রেণীর নরনারী অন্যদিকে তখনকার অর্থসম্পদ পরিপুষ্ট বণিকের সংসার। এবং পিছনে রয়েছে ধর্ম জাতি বৃত্তিভেদের নিয়ামক জমিদার সম্প্রদায়—এই রাষ্ট্র ও সমাজকে মুকুন্দরাম আমাদের সামনে ছবির মত তুলে ধরেছেন। অন্ত্যজ মানুষেরা সেখানে আজকের মতই ভিন্ন জাতি। তারই মধ্যে গুজরাট নগর পত্তন উপলক্ষে বিভিন্ন জাতির পরিচিতি দিয়েছেন সহৃদয়ভাবে। তাঁদের স্বভাব, জীবনযাত্রার উপর আলোকপাত করেছেন। মুসলমানদের সম্পর্কে শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছেন,

বড়ই দানেশ মন্দ না জানে কপট ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ে।

এতে রাষ্ট্রব্যবস্থার অসাম্প্রদায়িকতা যেমন স্পষ্ট, তেমনি ব্যক্তি মুকুন্দরাম এখানে বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত। চরিত্র নির্মাণে মুকুন্দরামের দক্ষতা এবং মানবিকতা তাঁকে চরিত্রের গভীরে পৌঁছে দিয়েছে। সপত্নী ভয়ে ভীত ফুল্লরা হাটে গেছে কালকেতুর কাছে—বর্ণনা যেমন গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী তেমনি নাটকীয়তায় পূর্ণ। সংক্ষিপ্ত অথচ উজ্জ্বল বর্ণনায় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব সবই আছে। মুরারি শীল, ভাঁড়ু দত্তের মত জীবন্ত চরিত্রনির্মাণ যে কোনো শিল্পীর পক্ষে গৌরবের।

পরবর্তী কাহিনিতে মুকুন্দরামের সমবেদনা এতটা নেই। ধনপতির চরিত্রে কোনো নৈতিকতা নেই। লহনাকে প্রবোধ দিয়ে খুল্লনাকে বিবাহ করা, শহরে প্রমোদে মত্ত থাকা ইত্যাদি তার চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাবের পরিচয়। তবু কবিত্ব আছে। লহনা-খুল্লনা সম্পর্ক, দুর্বলা দাসীর প্ররোচনা, খুল্লনার বারমাস্যা, শ্রীমন্তর পিতার প্রতি ভালোবাসা মুকুন্দরাম যথার্থভাবে চিত্রিত করেছেন। মুকুন্দরাম দুঃখের কবি হলেও দুঃখবাদী নন—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উক্তি শিরোধার্য। দুঃখের নিকষে মুকুন্দরামের সহানুভূতি, হাস্যরস, কৌতুকস্নিগ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি আরও উজ্জ্বল। পরবর্তী কবি ভারতচন্দ্রে এই প্রাণরস নেই। নিঃসন্দেহে এই ধারার এবং মঙ্গল কাব্যধারার উজ্জ্বলতম কবি মুকুন্দরাম।

১৫.৫ সামগ্রিক বিশ্লেষণ

চণ্ডীমঙ্গল কাহিনির উপাদান মনসামঙ্গলের চেয়ে প্রাচীন কিন্তু ব্রতকথা-পাঁচালির স্তর ছাড়িয়ে সর্বজন গ্রাহ্য হয়ে উঠতে তার সময় লেগেছিল। চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডী নিজ পূজা প্রচারের জন্য অনেক ছলনা ও ক্রূরতার আশ্রয় নিয়েছেন কিন্তু মনসামঙ্গলের সঙ্গে তুলনায় তা অত্যন্ত মৃদু। দেবী চণ্ডী ক্রমে হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্বের সঙ্গে এতাত্মভাবে মিশে গেছেন এবং তার অনার্য উৎস আমরা প্রায় ভুলেই গেছি। তিনি পশুর দেবতা থেকে

পশু-হন্তার দেবতায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁর প্রসন্নতা অপ্রসন্নতা অনেকটাই খেয়ালে চলে—তার কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। কালকেতুকে ধনদান থেকে ধনপতিকে 'কমলে কামিনী' নিয়ে বিপর্যস্ত করা পর্যন্ত তাঁর সেই অনির্ণেয় মেজাজের জন্যই। চণ্ডী থেকে অন্নপূর্ণা এই ধারাবাহিক বিবর্তনের পথে তাঁর চরিত্রের যে উন্নতি হয়েছে তা সমাজ এবং কবিমনের উৎকর্ষের সঙ্গে অনেকটাই জড়িত।

মুরারি শীল, ভাঁড়ু দত্ত, ফুল্লরা, কালকেতু, লহনা, খুল্লনা, দুর্বলা দাসী এইসব জীবন্ত চরিত্রগুলি টাইপ হয়েও তাকে অতিক্রম করে আমাদের কল্পনাকে বহুভাবে সমৃদ্ধ করেছে। তৎকালীন জীবনচর্চায় ধনিক সম্প্রদায়ের বিলাস-বাহুল্য ও অনৈতিকতার কথা কবিরা ভুলে ভুলে যাননি—তারই প্রকাশ ধনপতি চরিত্রে।

মঙ্গলকাব্যধারার সবচেয়ে সার্থক দুজন কবি এই ধারায় আবির্ভূত হয়েছেন—মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র। চণ্ডীমঙ্গলের সার্থক কবির সংখ্যা অবশ্যই খুব অল্প কিন্তু তাও এই ধারাতেই কবি প্রতিভার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে।

একক : ১৬ অন্নদামঙ্গল

১৬.১ কবিজীবন

মঙ্গল কাব্যধারায় অন্নদামঙ্গল শেষ সংযোজন। চণ্ডী, কালিকা, অভয়া, অন্নপূর্ণা, অন্নদা একই দেবী নানান নামে চিহ্নিত ও বন্দিত। কালের প্রবাহ, ধর্মসংশ্লেষের শেষ অবস্থা, বিশেষত চৈতন্যপ্রভাব এই দেবীকে একেবারে অন্য চেহারা দিয়েছে। এই সময়ে ইনি জগন্মাতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। দাক্ষিণ্য ও বরাভয় তাই অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত অনন্দামঙ্গলে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। অন্নদামঙ্গলের প্রথম ও শেষ কবি ভারতচন্দ্র।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অনুরোধে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল রচনা করেছেন। রচনার সমাপ্তিকাল ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দ। ভারতচন্দ্রের রচনার পুঁথি দুর্লভ নয়। সবচেয়ে পুরোনো পুঁথি হ্যাল্‌হেড্ সংগৃহীত। কাব্যটি প্রথম ছাপিয়েছিলেন গঙ্গাধর ভট্টাচার্য ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে। পরে রাধামোহন সেন সমগ্র অন্নদামঙ্গল কাব্য কবিতায় রচনা করে টীকা-টিপ্পনী সমেত ছাপিয়েছেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ভারতচন্দ্রের পৌত্রের কাছে উপকরণ সংগ্রহ করে এর কিছু পরেই ভারতচন্দ্রের পূর্ণ জীবনী ও কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ করেন।

ভারতচন্দ্রের পৈতৃক নিবাস ছিল ভূরশিট পরগনার আধুনিক হাওড়া জেলার পেঁড়ো গ্রামে এঁরা ব্রাহ্মণ, জমিদার ছিলেন। নরেন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন ভারতচন্দ্র। পিতৃব্য রাজবল্লভের সহায়তায় কীর্তিচন্দ্র তাঁদের রাজ্য কেড়ে নিলে তাঁরা নিঃস্ব হয়ে যান এবং ভারতচন্দ্র নিকটবর্তী নওয়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে পালিয়ে যান। সেখানে টোলে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। সেখানেই মাত্র ১৪ বছর বয়সে একটি বালিকাকে বিবাহ করেন ও গৃহে ফিরে আসেন। অভিভাবকদের অপ্রসন্নতার কারণে আবার গৃহত্যাগ করেন এবং হুগলি জেলায় দেবানন্দপুর নিবাসী রামচন্দ্র মুন্সীর বাড়িতে থেকে ফরাসি শিক্ষা করেন। এখানেই তিনি প্রথম সত্যনারায়ণের পাঁচালি রচনা করে পাঠ করেন। ১৭৩৮ খ্রিস্টাব্দে গৃহে ফেরেন ও সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যাপারে তদ্বিরের জন্য বর্ধমান রাজার কাছে যান। এখানে কোনো কারণে তাঁকে কারারুদ্ধ হতে হয় এবং তিনি কারারক্ষীকে ঘুষ দিয়ে পালিয়ে যান। প্রথমে কটক, তারপর পুরী গিয়ে সেখানে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতে থাকেন। এই সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বৃন্দবান যাওয়ার সময়ে হুগলি জেলার খানাকুল-কৃষ্ণনগর গ্রামে শ্যালিকা-পতির কাছে ধরা পড়েন। তাঁদের অনুরোধে

সন্ন্যাসী-বেশ ত্যাগ করেন, পত্নীকেও আনিয়ে নেন এবং কাজের খোঁজে ফরাসডাঙার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাছে আসেন। ইন্দ্রনারায়ণ ফরাসি সরকারের দেওয়ান ছিলেন। তিনি ভারতচন্দ্রের কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের কাছে পাঠান। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে মাসিক ৪০্ টাকা বৃত্তি দিয়ে অন্নদামঙ্গল রচনা করতে বলেন। এবং কবিকে মূলাজোড় (বর্তমান শ্যামনগর) অনেক ভূসম্পত্তি দান করেন। এবার ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' রচনা করেন। পরে মূলাজোড় রামদেব নাগের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে 'নাগাষ্টক' নামে একটি দ্ব্যর্থবোধক কাব্য রচনা করেন। মাত্র ৪৮ বছর বয়সে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

১৬.২ কাব্যকাহিনি

অন্নদামঙ্গল কাব্য তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। এই তিনটি খণ্ড প্রকৃতপক্ষে এক একটি স্বতন্ত্র কাব্য। কোনোটির সঙ্গে কোনোটির সুদৃঢ় যোগ নেই। প্রথম খণ্ডই প্রকৃতপক্ষে 'অন্নদামঙ্গল' বা 'অন্নপূর্ণামঙ্গল।'। এই অংশ কবি মুকুন্দরামের অনুকরণে রচিত। দ্বিতীয় খণ্ড 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর' এবং তৃতীয় খণ্ড 'মানসিংহ-অন্নদামঙ্গল'—যা মানসিংহের বাংলা আক্রমণ ও প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের কাহিনি।

প্রথম খণ্ডে পঞ্চদেবতা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও অন্নপূর্ণাবন্দনা, গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য, কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার বর্ণনা ও পরে প্রথানুগতভাবে শিব-সীতার কাহিনি, সতীর অন্নপূর্ণারূপে শিবকে ভিক্ষাদান ইত্যাদি আছে। এর মধ্যে এসেছে বেদব্যাসের কথা, ব্যাসের বিভিন্ন দেবতার মধ্যে দোলাচল, ব্যাসের কাশীনির্মাণ, অন্নদার জরতীবেশে ব্যাস ছলনা, ব্যাসের শাপ ইত্যাদি। এরপর কুবেরের পুত্র বা অনুচর বসুন্ধরের প্রতি অন্নদার শাপ ও বসুন্ধরের হরিহোড় রূপে জন্ম, হরিহোড়ের প্রতি অন্নদার কৃপা ও পরে ছলনা করে ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে গমন। ভবানন্দ কুবেরের অন্যতম পুত্র শাপগ্রস্ত নলকুবের এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ।

এরপর এসেছে 'কালিকামঙ্গল' বা বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি। কাহিনিটি পূর্বেই বাংলায় অনূদিত হয়েছে যার উৎস বিহ্লনের 'চৌর পঞ্চাশিকা' বা 'চৌরপঞ্চাশ্য' এর প্রথম অনুবাদক কাশীনাথ সার্বভৌম। ভারতচন্দ্রের কাহিনির পটভূমি বর্ধমান। 'বিদ্যালাভ' দ্ব্যর্থক। বিদ্যা অর্জনও বটে, রাজকন্যা বিদ্যাকে লাভও বটে। হীরা মালিনীর গৃহে অবস্থান করে সুন্দর সুড়ঙ্গ কেটে বিদ্যার গৃহে যাতায়াত শুরু করে, ধরা পড়লে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। মশানে দেবীর স্তোত্রপাঠ করে সে মুক্তিলাভ করে এবং রাজকন্যাও লাভ করে।

তৃতীয় কাহিনি মানসিংহ-অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্রের নিজস্ব রচনা। প্রথম অংশে ভবানন্দ মজুমদারের প্রতি দেবীর কৃপা ও দ্বিতীয় অংশ মানসিংহের বর্ধমানে আগমন। মানসিংহের উদ্দেশ্য প্রতাপাদিত্যকে দমন। ভবানন্দ মানসিংহের কানুনগো ছিলেন। মানসিংহের অনুরোধে ভবানন্দ তাকে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি শোনান। যোগসূত্র এইটুকুই। প্রতাপাদিত্য পরাজিত হলে ভবানন্দ খেলাৎ গ্রহণের জন্য দিল্লি যান, সেখানে অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য প্রচার করেন এবং 'রাজা' খেতাব লাভ করেন।

১৬.৩ ভারতচন্দ্রের কবিত্ব শক্তি

ভারতচন্দ্র যে যুগে কাব্যরচনা করেছেন, তা দৈবনির্ভরতার যুগ নয়। ইতিহাস এবং দেবমহিমার মেলবন্ধন ঘটানোও অসম্ভব। এখানেই ভারতচন্দ্রের কেন্দ্রীয় দুর্বলতা। কালকেতু ও হরিহোড় উভয়েই দারিদ্র্যের নিঃসীম

যন্ত্রণা ভোগ করেছে কিন্তু যে সারল্য, অকপট দেবনির্ভরতা কালকেতুর পক্ষে সম্ভব তা বাস্তব-সচেতন হরিহোড়ের পক্ষে সম্ভব নয়। ভারতচন্দ্রের জীবনবোধ এতটাই প্রখর, সুস্পষ্ট ও যুক্তিনিষ্ঠ যে তা নির্বিবাদে দেবতাকে আশ্রয় করতে পারে না। কাজই এই কাব্যের ভক্তির বাতাবরণ ও কৃত্রিম, শিল্পচাতুর্যের দ্বারা মণ্ডিত। ভারতচন্দ্র বহুদনি পর্যন্ত, অন্ততঃ মধুসূদনের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত তাঁর পরবর্তীকালের কবিদের দ্বারা অনুসৃত হয়েছেন।

ভারচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে সচেতনভাবে মণ্ডনকলাকে আশ্রয় করেছেন। কাব্যভাষাকে নিজ অভিপ্রায় অনুসারে ব্যবহার করা খুবই আধুনিক এবং বড় শিল্পীর লক্ষণ। তিনি বলেছেন—

না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি কথা যাবনী মিশাল।।

এবং—যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে। তৎসম, আরবি, ফারসি, লৌকিক ভাষা ইত্যাদিকে যথেচ্ছ ব্যবহার করে নতুন মঙ্গল আশে' তিনি কাব্যরচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, প্রথাগত অলংকরণও তাঁর প্রয়োগকৌশলে মৌলিক হয়ে উঠেছে। শ্লেষ ও যমকের অসাধারণ ব্যবহার 'ঈশ্বরী পাটনী অংশে অবিস্মরণীয়। ছন্দোনৈপুণ্য তাঁর আর একটি কাব্যরচনা কৌশল। বিষয় অনুসারে তিনি ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। ছোট ছোট পদগুলি গীতিকবিতার অভাব পুরণ করেছে। পয়ার, ত্রিপদী ছাড়াও দক্ষযজ্ঞের বর্ণনায় ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দের ব্যবহার বিষয়ানুযায়ী একেবারে অসামান্য। সেইসঙ্গে রুদ্র ও বীভৎস রসের বর্ণনা কবির দক্ষতা পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথকে বাদ দিলে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর কেউ করেননি।

'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য সম্পর্কে অনেকে অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছেন। হাস্যরসের মতই শ্লীলতা অশ্লীলতার সীমাও বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্রই নির্ধারণ করলেন। আধুনিক কাব্যের মাপকাটিতে ভারতচন্দ্রের বিচার চলে না কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে বড় কথা এই যে, এই অশ্লীলতা শিল্পিত। বঙ্কিমচন্দ্র সে সম্পর্কে বলেছেন, 'ভারতচন্দ্র আদিরস পঞ্চমে ধরিয়া জিতিয়া গেলেন। তির্যক ব্যঞ্জনায় কটাক্ষ-কৌতুকে অন্তরতলশায়ী বৈদগ্ধ্য এই অশ্লীলতাকে কাব্যসৌন্দর্যের আবরণে মণ্ডিত করেছে। মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মণ্ডনকলাবিদ তাই ভারতচন্দ্রই, যাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'রাজসভা কবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।

চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র দুর্বল। তাঁর মধ্যে ভাব গভীরতার অভাব ছিল। 'তিনি কাব্যের বহিরঙ্গ শোভার দিকে এত বেশি মনোযোগ দিতেন যে ভাবের সূক্ষ্মতা ও আবেগের গভীরতার দিকে তাঁহার বিশেষ নজর ছিল না'।— (ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। তবে, ব্যতিক্রমও ছিল, যেমন কয়েকটি চরিত্র, হীরামালিনী গতানুগতিক কুট্টনী চরিত্র হয়েও জীবনরসে উজ্জ্বল। এমনই আর একটি চরিত্র ঈশ্বরী পাটনী। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পৌরাণিক দেবাদিদেব শিব নিজ মহিমা বর্জন করে ছেলেদের খেলার সামগ্রী হয়ে উঠেছেন। 'দেবতাবাদের মুখোস' খুলে সেই মানব প্রাধান্য বাস্তববাদী ভারতচন্দ্রের রচনায় উজ্জ্বল। আবার সেই শিবই যখন বলেছেন,

চেত রে চেত রে চিত ডাকে চিদানন্দ।
চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ।।
যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী।
যে জন অচেতচিত্ত সেই দা দুখী।

তখন মুহূর্তে তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন সেই ভোলা মহেশ্বরকে যিনি সব দেবতারও দেবতা। 'অন্নদার জরতীবেশে ব্যাস ছলনা' দেবচরিত্রের অবনমনের আর একটি চিত্র অন্নদার স্বকার্য সাধনের নীচ প্রয়াস আমাদের চোখে তাঁকে মানবের চেয়েও হেয় করে তোলে। ভারতচন্দ্রের বেশ কিছু প্রৌঢ় উক্তি প্রবাসের

আকার নিয়েছে, যেমন—

'বড়োর পিরীতি বালির বাঁধ'
'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?'
'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর',
'খুঞা তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত'
ইত্যাদি এর সামান্য কিছু উদাহরণ।

১৬.৪ সামগ্রিক বিশ্লেষণ

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের চারশো অথবা পাঁচশো বছরের মঙ্গলকাব্যের ধারা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে পৌঁছে তার সমাপ্তি চিহ্নিত করেছে। ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে এবং পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। ইংরেজ কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব ভারতচন্দ্রে ছিল না কিন্তু সামাজিক পটপরিবর্তন—ইতিমধ্যেই ফরাসীদের আধিপত্য মোগল শাসনের প্রায় অবসান সমাজ-সচেতন কবি ভারতচন্দ্রকে নিশ্চয়ই প্রভাবিত করেছিল। ভারতচন্দ্র বুঝেছিলেন যে, তৎকালীন যুগে দেবতার কাছে ভক্তিবিহ্বল আত্মসমর্পণ আর সম্ভব নয়। সম্ভব নয় পূর্বের সারল্য বাঁচিয়ে রাখা। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে যে 'নূতন মঙ্গল তিনি রচনা করেছিলেন তার একটি অংশ বিশেষভাবে ইতিহাস—বিবৃতি। সচেতনভাবে ভবানন্দ মজুমদারের প্রতি দেবীর কৃপার পটভূমি নির্মাণ করতে গিয়ে তাঁকে অন্নদার ভূতপ্রেতের সাহায্য নিতে হয়েছে। এমনকি দিল্লী দরবারেও তারা প্রভাব বিস্তার করে মোগলদের ভক্তি আদায় করেছে। এর অসম্ভাব্যতা ভারতচন্দ্রের অবিদিত ছিল না। তাই কাব্য হিসাবে বিবৃতি মূলকতা ছাড়া এই অংশে আমাদের কিছুই প্রাপ্তি ঘটে নি।

যেখানে ভারতচন্দ্রের স্বতঃস্ফূর্ততা। তা, শিল্পিত সৌন্দর্য। সেখানে প্রথাগত নিয়মের আশ্রয় না নিয়ে তিনি সমৃদ্ধ। শিথিল রচনাভঙ্গি, মননহীন আবেগ, গ্রাম্য সংস্কারের বদলে ভারতচন্দ্রে এল সুমার্জিত বৈদগ্ধ্যপ্রধান মনন, সুনির্বাচিত শব্দবন্ধ, দৃঢ় প্রত্যয়ী অলংকরণ। যে বিদ্যাসুন্দর মূল কাহিনির অন্তর্গত নয়, তার আদিরসকে শিল্পসৌন্দর্যের আবেষ্টনীতে রাজসভার নাগরিক রুচির উপভোগ্য করে তুলেছেন তিনি। ভক্তের নীতিহীনতাকে এখানে দেবী প্রশ্রয় দিয়েছেন।

ভোগবিলাস—প্রাচুর্যের দেবী অন্নপূর্ণা। ঈশ্বরী পাটনীর ক্ষুদ্র আর্তি 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' এই স্বচ্ছলতার আবেদনের পিছনে যুগের প্রয়োজনই কাজ করেছে। দেবতাদের নিয়ে কৌতুক, পরিহাস, রঙ্গপ্রিয়তা এই যুগের চাহিদাকেই তৃপ্ত করেছে।

ভারতচন্দ্র পরবর্তী কালকে প্রভাবিত করেছেন—অন্ততঃ একশো বছর বাঙালি ভারতচন্দ্রেই তৃপ্ত হয়েছে। বৈষ্ণব-শাক্ত পদাবলীর রসসিঞ্চনে তাঁর লেখা ছোটো ছোটো গীতগুলি সমৃদ্ধ হয়ে পরবর্তীকালে প্রবাহিত হয়েছে। বিষয় নয়, প্রকাশই যে সাহিত্য, ভারতচন্দ্র তা প্রমাণ করেছেন।

১৬.৫ সংক্ষিপ্তসার

বাংলায় চণ্ডীপূজার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। মূলত চৈতন্য পরবর্তী যুগে চণ্ডীমঙ্গলের নিদর্শন পাওয়া যায়। চণ্ডীদেবীর উৎপত্তি সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য এখানে উল্লিখিত। বাংলাদেশের চণ্ডীমঙ্গলের দেবী চণ্ডীর বিকাশের মূলে আছে মেয়েলি ব্রতকথার প্রভাব। চণ্ডীমঙ্গলের দুটি কাহিনি—আঘোটক খণ্ড ও বণিক খণ্ড। প্রথমটি ব্যাধ কালকেতু

এবং দ্বিতীয়টি বণিক ধনপতির উপাখ্যান। কয়েকজন মুখ্য কবির প্রচেষ্টায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার জন্ম। এঁরা হলেন—মাণিক দত্ত, দ্বিজ মাধব, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি। মঙ্গলকাব্য ধারার সার্থক দুজন কবি এই ধারার আবির্ভূত হয়েছেন—মুকুন্দরাম এবং ভারতচন্দ্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র। মঙ্গলকাব্য ধারায় অন্নদামঙ্গল শেষ সংযোজন। অন্নদামঙ্গলের প্রথম এবং শেষ কবি ভারতচন্দ্র। কবির ব্যক্তি পরিচিতি ও তাঁর সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ণ এখানে আছে। অন্নদামঙ্গল কাব্য তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রত্যেকটি খণ্ড প্রকৃতপক্ষে এক একটি স্বতন্ত্র কাব্য। তিনটি খণ্ড হল—অন্নদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর এবং মানসিংহ বা অন্নপূর্ণা মঙ্গল। নতুন কাব্যরীতির আভাস এই কাব্যে দেখা যায়। কাব্যখানি প্রাসাদগুণ সম্পন্ন, ভাষা সম্পদে পরিপূর্ণ। ভারতচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে সচেতনভাবে মণ্ডলকলাকে তুলে ধরেছেন। গ্রামীণ কথ্যভাষাও তাঁর লেখনীস্পর্শে গৌরবের স্থান দখল করেছে। সরসতা, কৌতুকপ্রিয়তা, বাগবৈদগ্ধ্য ইত্যাদি গুণের জন্য ভারতচন্দ্র স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

১৬.৬ অনুশীলনী

বিস্তৃত বিশ্লেষণাত্মক উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন—

১। চৈতন্য চরিতসাহিত্য রচনার কারণ নির্দেশ করে বাংলায় রচিত চৈতন্য-চরিতকাব্য গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

২। বৃন্দাবনদাস রচিত চৈতন্যভাগবত কাব্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করুন।

৩। বাংলায় রচিত শ্রেষ্ঠ চৈতন্য-চরিত কাব্য কোনটি? গ্রন্থটির কবি ও কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবের ইতিহাস ও মঙ্গলকাব্যের ধারাগুলির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৫। 'মনসামঙ্গল' কাব্যের উদ্ভবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এই ধারার একজন সুপরিচিত কবি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬। মনসামঙ্গলে'র কাহিনি সংক্ষেপে বলুন ও এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৭। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যধারার পরিচয় দিয়ে এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৮। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যধারার পরিচয় দিয়ে এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবির সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৯। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে? তাঁর কৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

১০। কবি ভারতচন্দ্রের কাব্য এবং তাঁর কবিকৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন:

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে বলুন।

২। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবতে'র ঐতিহাসিক গুরুত্ব কোথায়, তা বলুন।

৩। 'চৈতন্য ভাগবত' কাব্যের রচয়িতা কে? কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৪। কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থ কয়টি ভাগে রচিত? এই ভাগগুলির নাম এবং কেন কবি এই নাম দিলেন, তা বলুন?

৫। 'চৈতন্যলীলায় ব্যাস বৃন্দবান দাস'—সমালোচকের এই উক্তির তাৎপর্য বিচার করুন।

৬। মঙ্গলকাব্যের ধারাগুলির শ্রেণীবিভাগ করুন।

৭। 'মনসামঙ্গল' কাব্যের চাঁদ সদাগর চরিত্রটি কেমন ছিল বলুন।

৮। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যরচনার পটভূমি কোন সমাজ ছিল সংক্ষেপে বলুন।

৯। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কবি মুকুন্দরাম ছাড়া অন্য কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

১০। 'অন্নদামঙ্গল কাব্যে কয়টি কাহিনি আছে? কাহিনিগুলিকে কীভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে?

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)*, ড. সুকুমার সেন।

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয় খণ্ড), ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধায়।

৩। *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা*, ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। *বৈষ্ণব রস প্রকাশ*, ড. ক্ষুদিরাম দাস।

৫। *শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান*, ড. বিমানবিহারী মজুমদার।

৬। *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৭। *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম*, ড. সুখময় মুখোপাধ্যায়।

নোটস্

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

মডিউল : ৪

অন্ত্য-মধ্যযুগ-২

একক ১৭-১৮ ❐ প্রণয়োপাখ্যান : শাহ মুহম্মদ সগীর, দৌলত কাজী, আলাওল

গঠন

১৭-১৮.১ উদ্দেশ্য
১৭.২ প্রস্তাবনা
১৭.৩ শাহ মুহম্মদ সগীর ও তাঁর গ্রন্থ পরিচিতি
১৭.৪ দৌলত কাজী—জীবন ও কাব্য
১৮.১ কবি পরিচিতি
১৮২. পদ্মাবতীর কাহিনি
১৮.৩ সংক্ষিপ্তসার
১৮.৪ অনুশীলনী

১৭-১৮.১ উদ্দেশ্য

এ একক পাঠে আপনি মুসলমান কবিদের বাংলা ভাষায় নানা অবদানের কথা জানতে পারবেন। জানতে পারবেন আরাকান রাজ্যসভার কথা। জ্ঞাত হবেন প্রণয় কাহিনির ঐতিহ্য সম্পর্কে। আর বিশেষভাবে জানবেন শাহ মুহম্মদ সগীর, দৌলত কাজী এবং সৈয়দ আলাওল সম্পর্কে।

১৭.২ প্রস্তাবনা

ভারতে বিজেতাদের ধর্ম ইসলাম, অন্য বহিরাগত ধর্মের মত ভারতীয় ঐতিহ্যে মিশে যায়নি। মূর্তিপূজার বিরোধিতায়, খাদ্যাখাদ্যে, ভাষা ব্যবহারে তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজয়া রাখে। হিন্দুধর্ম সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব ছিল প্রবল। সে সময় নানা বেসরা মুফি ভারতীয় ঐতিহ্যে লিপ্ত হয়ে, ভিন্ন রীতির ইসলাম প্রচার করত। তারা সমন্বয়কে গুরুত্ব দিত। ইসলামের ভারত বিজয়ের আগেই চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলমানদের উপনিবেশ গড়ে ওঠে। বৌদ্ধ-হিন্দুদের সঙ্গে নানা সমন্বয় ঘটে। আরাকানে বৌদ্ধরাজাদের প্রযত্নে বাঙ্গালি মুসলমানেরা সাহিত্য রচে। এখানে সুফি-ফকিরদের প্রাধান্য ছিল।

ধর্মান্তরিত বাঙালি মুসলমানের সমাজে গুরুত্ব পায়।

অন্যদিকে বঙ্গের স্বাধীন সুলতানেরা দিল্লির মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টায় বঙ্গদেশ এবং বাংলাভাষাকে গুরুত্ব দেন। ইলিয়াস শাহী আমলে শাসকদের এ চেষ্টা, জনগণের ধর্মীয় ভেদকে স্তিমিত করে। বেসরা সুফিরা, ধর্মান্তরিত দেশীয় মুসলমানেরা ক্রমে সমন্বয় এবং সহনশীলতাকে গুরুত্ব দেয়। শাসকদের সমর্থনে শিক্ষিত মুসলমানেরা মধ্যপ্রাচ্য থেকে নানা উপাদান সংগ্রহ করে বাংলা ভাষায় পরিবেশন শুরু করেন।

ধর্ম বা দেবদেবীর কথা বাদ দিয়ে মানুষের প্রেম ভালোবাসার গল্প, বৈষ্ণব ও সুফি দর্শনে গুরুত্ব পায়। এ প্রণয় কাহিনি ভারতীয় ধ্রুপদী ঐতিহ্য, লৌকিক ঐতিহ্য এবং আর্বিকার্সির ঐতিহ্য আকর্ষণ করে কবি সাহিত্যিকদের। এ সময়ে এ বিষয়টি বঙ্গ সাহিত্যে শত পুষ্পে বিকশিত হয়।

১৭.৩ শাহ মুহম্মদ সগীর ও তাঁর গ্রন্থ পরিচিতি

শাহ মুহম্মদ সগীরের, 'ইউসুফ জোলেখা'-এর পাণ্ডুলিপি ছিল আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদের কাছে। দেশভাগের অনেক পরে তিনি এ সকল পাণ্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেন। ঢাকার গবেষকেরা সগীরের গ্রন্থের অন্যত্র পাণ্ডুলিপি পাওয়ার কথা জানিয়েছেন। অবশেষে ১৯৮৪-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এনামূল হক এবং আহাম্মদ শরীফের সম্পাদনায় 'ইউসুফ জোলেখা' প্রকাশিত হয়। সগীরের রচনায় সন তারিখের উল্লেখ নেই। পৃষ্ঠপোষকের নাম অস্পষ্ট ভাবে উচ্চারিত হয়েছে এখানে। মুহম্মদ শহীদুল্লাএ পুঁথির প্রাচীনত্ব সমর্থন করেছেন। উত্তরকালে আবদুল হাকিম, ফকির শরীবুল্লাহ প্রমুখের রচিত 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য পাওয়া গেছে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশভাগের পূর্বযুগে, আবদলু করিম সাহিত্য বিশারদের সংগৃহীত এ পুঁথির পরিচয় অজ্ঞাত থাকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় কেউ এ পুঁথির পাণ্ডুলিপি দেখেন নি। তাঁর মতে এ কাব্যের ভাষা পঞ্চদশ শতকের প্রাচীন ভাষা নয়। লেখক, কথকেরা সেকালে পুঁথির ভাষা বদলাতেন।

কাব্য পরিচয়

বঙ্গদেশে প্রাপ্ত মুসলমান কবিদের রচনাবলির মধ্যে সগীরের পুঁথি প্রাচীনতম। সপ্তদশ শতকের আরাকান রাজসভার কবিদের প্রণয় কাহিনির অনেক আগে তার ইউসুফ জোলেখা রচিত হয়েছিল। তার সঠিক রচনাকাল নিয়ে মতভেদ থাকলেও, তাকে পঞ্চদশ শতকের বড়ু চণ্ডীদাসের পরবর্তী স্তরের কবি মনে করা হয়। তিনি সম্ভবত সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজমের কর্মচারী ছিলেন। মুসলমান লেখকদের বাংলা ব্যবহারকে ধর্মনেতারা খুব একটা সমর্থন করতেন না। কিন্তু হিন্দি অবধিতে মুসলমান কবিরা প্রেমকাহিনি রচেছিলেন। তখন শাসকদের সমর্থন এসেছিল বাংলা রচনার পক্ষে। গিয়াসুদ্দিন হাফিজ, বিদ্যাপতির ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সগীর লিখেছেন,

'না লিখে কিতাব কথা মনে ভয় পায়।
দুষিব সকল তাক ইহা না জুয়ায়।।
গুনিয়া দেখিলু আম্হি ইহা ভয় মিছা।
না হয় ভাষায় কিছু হয় কথা সাঁচা।।

মাতৃভাষার ব্যবহারেও সগীর আরকান রাজসভার কবিদের অগ্রজ পথপ্রদর্শক ছিলেন।

সগীর তার কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন কোরানের সুরা ইউসুফ থেকে। ওয়াকিল আহমেদ দেখিয়েছেন যে, ইমাম গাজালীর কোরানের তপসির ব্যাখ্যা পুস্তকের সঙ্গে সগীরের রচনার মিল বেশি। একাদশ শতকে রচিত ফেরদৌসী তুসীর 'ইউসুফ জোলেখা' এখানে অনুসৃত হয়েছে। সমাপ্তির আমিন-বিধুপ্রভার প্রণয় কাহিনি কবির নিজস্ব সংযোজন। সগীর অনুবাদে আন্তরিক, ভাব না ছায়ানুবাদের রীতি অনুসরণ করেছেন, সে আলোচনা তার সমালোচকেরা করেন নি।

কাব্যটি শুরু হয়েছে আল্লারসুল, যাবাবা এবং রাজস্তুতি দিয়ে। তৈমুস বাদশার মেয়ে জোলেখা যৌবনাগমে এক সুন্দর পুরুষকে স্বপ্নে দেখে। তার বিয়ে হয় যে আজিজ মিশরের সঙ্গে, সে কিন্তু স্বপ্নে দেখা সুন্দর ছিল না, উপরন্তু সে ছিল ক্লীব। এখানে ইউসুফের জন্ম, সৎ ভাইদের তাকে কুয়োয় ফেলে দেওয়া, কুয়ো থেকে উদ্ধার করে তাকে বাজারে দাস হিসাবে বিক্রয় করার গল্প পাওয়া যায়। নীলনদের জলে স্নান করে ইউসুফ অপূর্ব সুন্দর হয়ে ওঠে। এ রূপে মোহিত হয়ে জোলেখা তাকে ঘরে নিয়ে যায়। গাঞ্জালীর অনুসৃত গল্পের মত এখানেও ইউসুফ জোলেখার দেহসঙ্গী না হওয়ায় তার উপর নানা অত্যাচার হয়। কিন্তু সগীর বৃদ্ধা জোলেখার যৌবনপ্রাপ্তি এবং ইউসুফের সঙ্গে তার ঘটাপূর্ণ বিয়ে দেখিয়েছেন। ফার্সি গল্পে ইউসুফ জোলেখার মিলনের পরে তাদের মৃত্যু দেখানো হয়েছে। কিন্তু

সগীর তারপরেও ইউসুফের ভাই আমিনের সঙ্গে গন্ধর্বরাজা শাহাবালের মেয়ে বিধুপ্রভার বিয়ে, গন্ধর্ব রাজ্যে বাস, অবশেষে মিশরে গমনের বিবরণে গল্পকে আরব, ভারত থেকে মিশরে নিয়ে গেছেন। এখানে ইউসুফের দিগ্বিজয়, তার ছেলেদের বিয়ে, রাজ্যভোগ পর্যন্ত কাহিনি বিস্তৃত হয়েছে।

ফারসি কাব্যে সুফিতত্ত্ব অনুসারে প্রেমস্রষ্টার স্বরূপ। ইউসুফ জোলেখা আসক মাসকের প্রতীক। কিন্তু সগীরের কাব্যে এ তত্ত্ব প্রাধান্য পায়নি। এখানে প্রতিমা পূজক জোলেখা এবং বিধুপ্রভা স্বধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ইউসুফ এবং আমিনাকে পেয়েছে। কাব্যের শেষে হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণের ডাক আছে। সুফ ভাবনায় এ ধর্মান্তর অনর্থক।

গল্পের ভাব পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে, ছন্দ অলংকারের ব্যবহারে, বর্ণনা রীতিতে, বারমাস্যা কথনে এ কাব্য বঙ্গের সামাজিক সাংস্কৃতিক রূপ ফুটে উঠেছে। কোরানের ইউসুফ ছিল ধর্মপ্রাণ, আদর্শ মানুষ। সগীর তার চরিত্রে নিষ্ঠা, ব্যক্তিত্ব, বৈষয়িক বুদ্ধিযোগ করে তাকে জীবন্ত মানুষ করে তুলেছেন। জোলেখা উগ্র কামনার দাহে সমাজধর্ম উপেক্ষা করে ইউসুফকে চেয়েছিল। প্রত্যাখ্যানে ভয়ঙ্করী হয়ে প্রেমিকের ক্ষতি করেছিল। এমন কামোন্মাদ চরিত্র বঙ্গ সাহিত্যে বিরল। কিন্তু তা উগ্রতা পরিশুদ্ধ হয়ে নম্র আত্মদানে সমাপ্ত হয়।

উত্তরকালের প্রণয় আখ্যানের পথপ্রদর্শক শাহ মুহম্মদ সগীর।

প্রসঙ্গত 'ইউসুফ-জোলেখা' গ্রন্থের সম্পাদক এনামুল হক ও ভূমিকা লেখক আহমদ শরীফের বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে, তা থেকে গ্রন্থটির আবিষ্কার ও অন্যান্য বিষয়ে জানা যাবে। আহমদ শরীফ গ্রন্থটির 'নিবেদন' অংশে যা লিখেছেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃতি করি—

"ড. মহঃ এনামুল হকের অনুরোধে তাঁর সম্পাদনার জন্যে এ-কাব্যের আদিলিপি তৈরি করেছিলেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রায় চল্লিশোর্ধ্ব বছর আগে। সে সময়কার একটি ঘটনার কথা বলি। এক সকালে সাহিত্য বিশারদ নকল করছিলেন 'নির্দয় ভাইদের দ্বারা ইউসুফ প্রকৃত হওয়ার' করুণ অংশটি। তিনি লিখছিলেন আর ঘনঘন চোখ মুছছেন। বড় বোন হঠাৎ এ দৃশ্য দেখে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বিস্মিত ও বিচলিত হয়ে প্রায় চিৎকার করেই বলেছিলেন, 'বড় জেয়া তুমি কাঁদছ কেন?' আমরা সবাই ওই চিৎকারে সত্তরোর্ধ্ব বয়সের বুড়োর কান্নার কথা শুনে ছুটে এলাম। জানা গেল নির্যাতিত বালক ইউসুফের জন্যেই এ কান্না। তখন আমাদের হাসির পালা শুরু হয়েছে। ঈষৎ বিব্রত সাহিত্য-বিশারদ তখন আত্মপক্ষ সমর্থনে বললেন, 'শ্রেষ্ঠ সাহিত্য তো মানুষকে অভিভূত করে, সহমর্মী করে, কাঁদায়, হাসায়।'

শাহ মুহম্মদ সগীরকে অবিসংবাদিত তথ্যে প্রমাণে চৌদ্দ-পনের শতকের কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই ড. মুহম্মদ এনামুল হক তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টায় ও যুক্তিপ্রয়োগ চিন্তায় চল্লিশ বছর অতিবাহিত করেছিলেন। স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে, বাংলা একাডেমিতে আর বাংলা উন্নয়ন বোর্ডে চল্লিশ বছর ধরে প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে প্রমাণ সংগ্রহ হয়েছে বিলম্ব এবং যুক্তিপ্রয়োগের কাল হয়েছে অতিক্রান্ত। ইতোমধ্যে আয়ু হল শেষ। সংকল্প রইল অপূর্ণ আর সিদ্ধি রইল অনায়ত্ত।'

আর উপক্রমণিকায় সম্পাদক মহাশয় (ড. এনামুল হক) বলছেন—"কিঞ্চিদধিক অর্ধশতাব্দী (১৯২৯) পূর্বকার ব্যাপার। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমভুক্ত 'ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষা সমূহের (Indian Vernacular) মধ্য হইতে 'বাংলা ভাষা'কে প্রধান ভাষারূপে বাছিয়া লইয়া আমি সদ্য এম.এ. পাশ করিয়াছি। ফলও আশানুরূপ হইয়াছে। তথাপি, মনে সম্যক প্রশান্তি নাই। বারংবার একটি প্রশ্ন মনে জাগিয়া উঠিতেছিল—মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সহিত পরিচয় হইল বটে, কিন্তু এই সময়ের, সঠিকভাবে বলিতে গেলে, সপ্তদশ শতাব্দীর একমাত্র 'আলাওল' ব্যতীত অন্য কোনো মুসলিম কবির কোনো অবদানের সন্ধান যে পাওয়া গেল না। বাঙ্‌লা সাহিত্য-সৃষ্টির

ক্ষেত্রে মুসলিম সুলতান ও তাদের আমীর ওমরাহের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রবর্তনা দানের পর্যাপ্ত উদাহরণ (তখন পর্যন্ত) পাওয়া না গেলেও এই ক্ষেত্রে দেশের মুসলিম জনসাধারণের দান এত অপ্রতুল কেন?...

"আমার ছাত্রজীবন হইতেই অর্থাৎ আমি যখন চট্টগ্রাম কলেজে পড়ি তখন হইতেই চট্টগ্রাম সুচক্রদণ্ডীর অমর সন্তান মরদুম আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩) সহোদয়ের সহিত আমার পরিচয় হয় ও ঘনিষ্ঠতা জন্মে। জানিনা কি কারণে, তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। এম.এ. পাশ করার পর হইতে যেই সমস্যাটি আমাকে নিপীড়িত করিতেছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে আমি তাঁহাকে আমার মনোবেদনার কথা জানাইলে... তিনি বলিয়াছিলেন... 'এই ইতিহাসের মধ্যযুগটি এখনও মুসলিম অবদানের বিবেচনায় সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই দিকটিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার উপযোগী বহু-মৌলিক উপাদান আমার নিকট সঞ্চিত আছে এবং ক্রমশ এক এক করিয়া সঞ্চিত হইতেছে।...

"এই সময়ে তাঁহার সহিত আমার সেই ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুকাল (১৯৫৩) অবধি তাহা আর কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নাই, বরং তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ফলে, তৎসংগৃহীত প্রায় দুই সহস্রাধিক হিন্দু মুসলিম পাণ্ডুলিপির পারিবারিক গ্রন্থাগারটির দ্বার আমার জন্য উন্মুক্ত হইয়া যায়। এই সময়ে শাহ মহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা' নামক কাব্যের পাণ্ডুলিপির সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। ...এই কাব্যের পাণ্ডুলিপিটির যেই কয়েকখানা পাণ্ডুলিপি তাঁহার গ্রন্থাগারে ছিল, তাহা পাঠ করিয়া আমার ব্যবহারের জন্য কাব্যটির একখানি 'Composite Version' বা সমন্বিত পাঠ পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি সানন্দ চিত্তে আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন।" [শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত ইউসুফ জোলেখা। সম. ড. মহঃ এনামুল হক, ৪র্থ মুদ্রণ, ২০০৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪। মওলা ব্রাদার্স। ঢাকা।]

কবির আবির্ভাব কাল নিয়ে গ্রন্থটিতে যা লেখা হয়েছে, তা হল—

"১৩৪৩ বঙ্গাব্দে বা ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর [ড. এনামুল হক] দেওয়া যুক্তিপ্রমাণ ছিল নিম্নরূপ:

"য়ূসুক জোলেখা কাব্যের ভাষা খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে (১৪৮০ খ্রী.) রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে'র মধ্যবর্তী ভাষা।" [দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৮]

১৭.৪ দৌলতকাজী—জীবন ও কাব্য

চট্টগ্রামের সংলগ্ন আরাকানের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। কিন্তু তাদের প্রজাদের এক বড় অংশ ছিলেন বাঙালি মুসলমান। রাজা এবং রাজপুরুষদের উৎসাহে সেখানে বাঙালি মুসলমান কবি সাহিত্যিকেরা এক সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন।

চট্টগ্রামের সুলতানপুরে ষোড়শ শতকের শেষভাবে জন্মেছিলেন দৌলত কাজী। আরাকান রাজ শ্রীসুধর্মার সময়ে (১৬২১-১৬৩৮) তার অন্যতম সেনানায়ক আসরাফ খানের সহায়তায় দৌলত কাজী লোরচন্দ্রানী বা সতীময়নার গান রচনা করেন। কবির অকাল মৃত্যুতে কাব্যটি অসমাপ্ত থেকে যায়। বিশ বছর পরে ১৬৫৯ নাগাদ এ কাব্যটি সম্পূর্ণ করেন সৈয়দ আলাওল।

উত্তর দক্ষিণ ভারতে লোরিকমল্লের কাহিনি জনপ্রিয় ছিল। মিয়া সাধন রচেছিলেন, 'মৈনা কা সত'; মুল্লা দাউদ রচেছিলেন, 'চন্দায়ন'। বিহার থেকে আগত গোপেরা মুর্শিদাবাদে এ কাহিনি, গোপ বীরলোরের সঙ্গে চামার বীর বামনের দ্বন্দ্বের কথা এখনো বলে। হিন্দি রচনা থেকে দৌলত সংগ্রহ করেছিলেন এ কাহিনির উপাদান। তাতে যুক্ত করেছেন নিজস্ব সংগৃহীত নানা উপাদান। এ অনুবাদে মূলের ছায়ামাত্র অনুসৃত হয়েছে।

লোর চন্দ্রানীর কাহিনিতে পাই যে, গোহারীর রাজকুমারী চন্দ্রানীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বামনবীরের। কিন্তু

সে ছিল নপুংসক। লোর একদা শিকার করতে গিয়ে চন্দ্রানীর সঙ্গে পরিচিত হয়। তারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দু'জনে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। পথে চন্দ্রানীর স্বামী বামন তাদের আক্রমণ করে। লোর বামনকে নিহত করে। চন্দ্রানীর বাবা মোহরার অনুরোধে লোর চন্দ্রানীকে বিয়ে করে, রাজ্যভার নিয়ে সুখে দিন কাটাতে থাকে। ওদিকে সতীময়না বিচ্ছেদের দুঃখে দিনযাপন করছিলেন। ছাতন নামে এক লম্পট রাজপুত্র ময়নাকে প্রলুব্ধ করে কিন্তু ব্যর্থ হন। তখন এক মালিনী পাঠিয়ে ছাতন ময়নাকে ক্রমাগত কুপ্রস্তাব দিতে থাকে। ময়নার দুঃখের এক বারমাস্যার বিবরণে জ্যৈষ্ঠ মাসের বর্ণনার পরে পরেই লোকান্তরিত হন দৌলত কাজী।

বিশ বছর পরে আলাওল বারমাসীটি শেষ করে এ কাব্যটি সমাপ্ত করেন। যে মালিনী ময়নাকে প্রলুব্ধ করছিল তাকে সতীময়না ফিরিয়ে দেন এবং দেন কঠোর শাস্তি। বিরহ পর্বে এক সখী গল্প শোনাত ময়নাকে। এমন এক গল্পে স্বামী পরিত্যক্তা এক নারীর এক ব্রাহ্মণের দৌতে স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটেছিল। ময়না এক ব্রাহ্মণকে দৌত্যে স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটেছিল। ময়না এক ব্রাহ্মণকে স্বামীর কাছে দূত হিসাবে পাঠায়। ইতিমধ্যে লোর চন্দ্রানীর ছেলে হয়েছে। তাকে রাজ্যভার দিয়ে চন্দ্রানী সহ লোর ফিরে এল ময়নার কাছে। সতী পতি পেল। দু'স্ত্রী স্বামীকে নিয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগলেন। স্বামী মারা গেল। চন্দ্রানী ময়না সহমৃতা হয়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

পাণ্ডু কুন্তী, দশরথ, রাধা আইহন কাহিনির অক্ষম স্বামীর গল্পবীজটি শাহ মুহম্মদ সগিরে এবং লোর চন্দ্রানীতে অনুসৃত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যেও এটি ফিরে এসেছে।

দৌলত কাজীর তুলনায় আলাওলের রচিত গল্পাংশ অনেক শিথিল এবং নিষ্প্রভ। কথিত উপকথাটিতে শকুন্তলার গল্পের আদল ফিরে এসেছে। বিচ্ছেদের কাহিনিকে আলাওল গতানুগতিক মিলনে সমাপ্ত করেছেন। আলাওল সুফি শাস্ত্রে এবং সংস্কৃত পুরাণ ও সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন। তার রচনায় এ সমস্ত অভিজ্ঞান মুদ্রিত হয়েছে। অন্যদিকে দৌলত কাজীর ভারতীয় সংস্কৃতি চেতনা তার রচনায় সহজ হয়ে মিশে গিয়েছিল।

দৌলত কাজীর ময়না ও চন্দ্রানী নারীসত্তার দ্বিবিধ পরিচয়কে চিহ্নিত করেছে। একদিকে ধর্মীয় অনশাসনে জাত সতীত্ব বোধ, অন্যদিকে নির্বাধভাবে জীবনকে উপভোগের উল্লাস এখানে দু'নারীর চরিত্রে খুঁজে পাই। ময়না সামাজিক অনুশাসনের কাছে তার আদর্শের কাছে কামনা বাসনাকে বলি দিয়েছে। অন্যদিকে বিবাহিত চন্দ্রা স্বামী ছেড়ে পরপুরুষে লগ্ন হয়েছে। স্বামীর হত্যায় সে দুঃখ পায়নি। ভোগ এবং যোগ, সংযম এবং স্বৈরাচার, সতীত্ব বনাম লালসার দ্বন্দ্ব এখানে দু'নারী চরিত্রে চমৎকার ভাবে ফুটেছে।

বাংলা ছন্দ অলংকার ব্যবহারে সার্থক হয়েছেন দৌলত কাজী। প্রবাদ প্রতিম বাক্যাংশের ব্যবহারে ঘনত্ব পেয়ে জীবন ঘনিষ্ঠ হয়েছে তার কাব্যভাষা। ফরাসি কিস্সার সঙ্গে ভারতীয় লোককথাকে, অভিযান কাহিনি, যুদ্ধের সঙ্গে প্রেমকে চমৎকার ভাবে মিশিয়েছেন। সুফি ভাবনা, ইসলাম সংস্কৃতির সঙ্গ হিন্দু যোগ-পুরাণ-সমাজভাবনকে তিনি সফলভাবে সমন্বিত করেছেন। হিন্দু সমাজের আচার আচরণ, সতীত্ব, সহমরণ এ কাব্যে মর্যাদা পেয়েছে। সগিরের কাব্যের ধর্মান্তরের উদ্দেশ্যে এখানে উচ্চারিত হয়নি।

পীর আউলিয়া, দেব দেবতার অলৌকিক কাহিনি ছেড়ে, ধর্মতত্ত্বকে সরিয়ে রেখে দৌলত কাজী মানুষের কামনা বাসনার, ত্যাগের কাহিনিকে নিয়ে এলেন সাহিত্যে। মুসলমান হয়েও হিন্দুসমাজের কাহিনি রচনা করে, ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য রচনার ভিত স্থাপন করলেন।

একক : ১৮ সৈয়দ আলাওল ও পদ্মাবতী

১৮.১ কবি পরিচিত

আরাকান রাজদরবারের কবি সৈয়দ আলাওল মধ্যযুগের বাংলার খ্যাতিকীর্তি কবি। দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্যটি তিনি সমাপ্ত করেন। এছাড়াও বহু গ্রন্থ তিনি হিন্দি, আর্বি-ফার্সি থেকে ভাষান্তর করেন।

তার আত্মপরিচয় পাই 'সেকেন্দার নামা' এবং 'সয়কুলমুলক বদিউজ্জমাল' গ্রন্থে। চট্টগ্রাম মতান্তরে ফরিদপুরের মুলুক ফতেহাবাদের জামালপুর গ্রামে কবি ষোড়শ শতকের শেষে জন্মান এবং ১৭৬৩ খ্রি. মারা যান। কবির পিতা রাজসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একদা জলপথে পর্তুগিজ দস্যুদের আক্রমণে কবির পিতা নিহত হন এবং কবি বন্দী হন। বহু বাঁধা বিঘ্নের ভেতর দিয়ে আলাওল শেষপর্যন্ত রোসাঙে আসেন এবং সৈন্যবিভাগে কাজ নেন। আরাকানের অমাত্য মাগন ঠাকুর, অর্থমন্ত্রী সুলেমান, পণ্ডিত সৈয়দ মুসা কবির গুণে মুগ্ধ হন। আরাকানরাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্মার নির্দেশে আলাওল কাব্যানুবাদ শুরু করেন। এরই মধ্যে তিনি আরাকানের জেলে বন্দী জীবন কাটিয়ে আবার পূর্বমর্যাদা ফিরে পেয়ে কাব্যরচনায় নিমগ্ন হন।

তার সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল (১৬৫৮-১৬৭০) এক ফার্সি গল্পের অনুসরণে লিখিত প্রেমকাহিনী। হপ্ত পয়কর (১৬৬০) ফার্সি কবি নেজামী সমরকন্দীর রচনানুসরণে বাহ্‌রামের যুদ্ধ জয় এবং সাত বৌ-এর গল্প। তোহফা (১৬৬৩-৬৪) ফার্সি লেখক শেখ রুসুকের 'তুহফাতুন্নসা' নীতিকাব্যের অনুবাদ।

ইরানি কবি নেজামি সমরকন্দের ফার্সিতে লিখিত কাব্য 'ইসকান্দারনামা' এর সরল অনুবাদ কাব্য হল 'সেকেন্দার নামা' (১৬৭২)। এখানে অনেক যুদ্ধের কথা এবং বিচিত্র সব গল্প পাই। আলাওলের এ সমস্ত রচনা মূলতঃ মুসলমান সমাজে সমাদৃত হয়েছিল।

আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্য বঙ্গভাষী হিন্দু-মুসলমান সমাজে সমভাবে আদৃত এবং গৃহীত হয়েছিল। এটি ছিল মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দির উপভাষায় রচিত 'পদুমাবৎ' কাব্যের অনুবাদ।

১৮.২ পদ্মাবতীর কাহিনি

চিতোরের পদ্মাবতী এবং আলাউদ্দিনের কাহিনি এক জনপ্রিয় লোককথা। চিতোরের রাজা রত্নসেন স্ত্রী নাগমতীর সঙ্গে দিন যাপনের সময় সিংহল রাজকন্যা পদ্মিনীর রূপগুণের খ্যাতি শুনে এক শুকপাখি নিয়ে সিংহলে গিয়ে, পদ্মাবতীকে নিয়ে ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে পদ্মাবতীর রূপের কথা দিল্লির বাদশা আলাউদ্দিনের কানে পৌঁছায়। আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করে রত্নসেনকে বন্দী করে নিয়ে যান, রত্নসেন কৌশলে পালিয়ে আসেন চিতোরে। এদিকে রত্নসেনের অনুপস্থিতিতে রাজা দেওপাল পদ্মাবতীকে হাতিয়ে নেওয়ার বিফল চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। রত্নসেন ফিরে এসে দেওপালকে যুদ্ধে হত্যা করেন। কিন্তু নিজেও আহত হয়ে মারা যান। পদ্মাবতী নাগমতী স্বামীর চিতায় সহমৃতা হন। ঠিক তখনই আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করে রাজপ্রসাদে উপনীত হন। তিনি সহমৃতাদের জ্বলন্ত চিতায় প্রণাম করে ফিরে যান।

জায়সীর কাব্যে সুফি প্রতীকে চিতোর মানবদেহ, রত্নসেন জীবাত্মা, পদ্মিনী বিবেক, শুকপাখি ধর্মগুরু। এখানে নারী নিয়ে সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের নামগন্ধ নেই। আলাওল ফকির ছিলেন। বহুক্ষেত্রে তিনি জায়সীর হুবহু ভাষান্তর করেছেন। কিন্তু আলাওলের কাহিনি, ঘটনা, চরিত্রে বাংলাদেশের সমাজ ও পরিবেশ ফুটে ওঠে। এ কাব্যে এগারোটি সুন্দর গান আছে। পয়ার ত্রিপদী ছন্দে আলাওল ছিলেন দক্ষ; অলঙ্কার ব্যবহারে নিপুন। পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনায় আলাওল সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র অনুসরণ করেছেন। বিঙ্গলের অষ্টমহাগণতত্ত্ব, আয়ুর্বেদের

নানা তত্ত্ব, জ্যোতিষ, স্বপ্নতত্ত্ব আলোচনায় আলাওল বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। যুদ্ধ, ঘোড়দৌড়, শিকার, হাতি, ঘোড়ার নানা খেলা এ কাব্যে চমৎকার ভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রবাদপ্রতিম বাক্যাংশের ব্যবহার তার কাব্যভাষাকে দিয়েছে সংহতি। অনুবাদে তার কৃতিত্ব অসাধারণ।

আলাওলের প্রায় সব রচনাই অনুবাদমূলক। তথাপি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আলাওল এক অসাধারণ কবি।

১৮.৩ সংক্ষিপ্তসার

আরাকান রাজসভার কবিদের আগে মানবজীবনের প্রেমকাহিনি রচেন শাহ মুহম্মদ সগীর, বাংলা কাব্যে নূতন সুর এনেছেন। কোরান এবং ফার্সি কাব্য থেকে উপাদান এনে, সেগুলিকে পুনর্নির্মাণ করে সগীর বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। নারীর কামনাবাসনা এ কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে। বিদ্যাসুন্দরে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এ সুর শোনা যায়।

আরাকান রাজসভাকে কেন্দ্র করে ফকির-দরবেশী ভাবাপন্ন কবিরা বাংলা ভাষায় নানা ধরনের রচনা রচেন। এদের ভাষা-প্রীতি 'বাংলাদেশ' আন্দোলনের আদিসূত্র। সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য অমান্য করে দৌলতকাজী হিন্দু সমাজের কাহিনি নিয়ে লেখেন 'লোরচন্দ্রাণী'। আলাওল লেখেন 'পদ্মাবতী'। এ রচনাগুলিতে বঙ্গতথা ভারতীয় ঐতিহ্যের ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কার-সাহিত্যিক ঐতিহ্য, যোগতন্ত্র, হিন্দু সতীত্বের আদর্শকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এমন কী সহমরণ গুরুত্ব পেয়েছে। এদের রচনা অনুবাদ হলেও নানা মৌলিক উপাদানে উজ্জ্বল। এ রচনাগুলি হিন্দু সমাজেও জনপ্রিয় হয়েছে। আলাওল আর্বি-ফার্সি-হিন্দি থেকে অনুবাদ করেছিলেন হপ্ত পয়কর, সেকেন্দারনামা, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল। সবগুলিই অভিযান এবং প্রেমের গল্প।

তখনকার বাংলা কাব্যে দেবদেবীর প্রাধান্য ছিল। দৌলত কাজী এবং আলাওল সামাজিক মানুষের প্রেম ভালবাসার গল্প এনে, বাংলা সাহিত্যে মানুষ এবং তার বাস্তব জীবনকে গুরুত্ব দিলেন। সাম্প্রদায়িকতাকে অগ্রাহ্য করলেন। 'বাংলায় হিন্দি ফার্সি রোমান্টিক কাব্য ধারার ভগীরথ হচ্ছেন রোসাঙ দরবারের দু'জন সভা কবি দৌলতকাজী এবং আলাওল' (সুকুমার সেন)।

১৮.৪ অনুশীলনী

বিস্তৃত বিশ্লেষণাত্মক উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন—

১। সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবিদের সম্পর্কে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারাই মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিকতা ভঙ্গ করিয়া নূতনত্বের পরিচয় দেন—এ বিষয়ে আপনার মতামত দিন।

২। সপ্তদশ শতাব্দীর আরাকান রাজসভার কবিদের সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।

৩। শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যকৃতিত্ব নিয়ে আলোচনা করুন।

৪। রোমান্টিক প্রণয়কাব্য রচনায় দৌলত কাজীর সাফল্যের পরিচয় দিন।

৫। আলাওলের রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে তাঁর রচিত 'পদ্মাবতী' কাব্যের গুরুত্ব বিচার করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন—

১। 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যর কাহিনির উৎস সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যের কাহিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৩। শাহ মুহম্মদ সগীরের প্রণয় কাব্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৪। একটি অসমাপ্ত কাব্য লিখ দৌলত কাজী বাংলা সাহিত্যে কেন স্মরণীয় হয়ে আছেন?

৫। আলাওলের বিচিত্র জীবন সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

একক ১৯-২০ ☐ শাক্ত পদাবলী : রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

গঠন

১৯-২০.১ উদ্দেশ্য
১৯.২ প্রস্তাবনা
১৯.৩ শাক্ত পদাবলির প্রাচীন ঐতিহ্য এবং দেশ, কাল, বিষয়
১৯.৪ রামপ্রসাদ সেন
২০.১ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য
২০.১ সংক্ষিপ্তসার
২০.২ অনুশীলনী

১৯-২০.১ উদ্দেশ্য

এ এককটি পড়ে আপনি শক্তিদেবীকে নিয়ে চূর্ণ কবিতার বঙ্গীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হবেন। বাঙালি হিন্দু উচ্চবর্ণের বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, কুলীনপ্রথা, বধূ নির্যাতন ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে মিশেছে শাক্তপদে। বাঙালির তান্ত্রিক ঐতিহ্য, মায়ের গুরুত্বের ও বিবরণ পাবেন এখানে। রামপ্রসাদ ছিলেন শাক্তপদের উদ্‌গাতা স্রষ্টা। আর কমলাকান্ত ছিলেন তার সফল উত্তর সাধক। এ দুজনের কাব্যের সঙ্গে পরিচয় হবে আলোচ্য এককে।

১৯.২ প্রস্তাবনা

অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্য আলোচনায় কাব্যরস বৈচিত্র্যে শাক্তপদাবলী উল্লেখযোগ্য। শাক্ত পদাবলীর সীমা মাত্র একশ বছর। বর্গির হাঙ্গামা, রাজকর্মচারীদের শোষণ এবং শাসনের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য দেবী কালিকার প্রতি ভক্তের অভিযোগ, আবদার, আর্তি ও মুক্তি প্রার্থনা শাক্ত পদাবলিতে প্রকাশ পেয়েছে। রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত চক্রবর্তী এই দুই পদকর্তা সমাজের দুঃখ-বেদনা-আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একাত্ম হয়ে শাক্ত পদাবলি রচনা করেছেন। এই রচনায় শাক্ততত্ত্ব যতটা না প্রকাশ পেয়েছে, তার চেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছে সমাজকেন্দ্রিক ভাবনা। এদের পদ রচনার বৈশিষ্ট্যও এখান থেকে জানা যাবে।

১৯.৩ শাক্ত পদাবলির প্রাচীন ঐতিহ্য এবং দেশকাল, বিষয়

বঙ্গের তান্ত্রিক ঐতিহ্য সুপ্রসিদ্ধ। পঞ্চোপাসক হিন্দুদের শক্তি উপাসনার রীতিটিও সুপ্রাচীন। তান্ত্রিকচক্রে জাতিবিচার ছিল না। ব্যক্তিগত গোপন তান্ত্রিক সাধনার সমান্তরালে সমাজে নানা দেবী পূজার চলন ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সমসময়েই কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রমুখের পরিচালনায় কালিকা এবং বাসন্তী, দুর্গা পূজা বঙ্গে প্রাধান্য পায়। নানা মঙ্গলকাব্যে, শিবায়ন ইত্যাদিতে, পুরাণে, সংস্কৃত কাব্য কবিতায়, চণ্ডীতে শিবদুর্গার কাহিনি পাওয়া যায়। সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ কবিতায় শাক্ত চূর্ণ কবিতার নিদর্শন পাওয়া যায়।

বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম এবং পদাবলি, যুগ পরিবর্তনে প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে। বৈষ্ণবতন্ত্র নিম্নবর্গে প্রাধান্য বিস্তার করে। বৈষ্ণবীয় আনন্দবাদ এবং মধুর রসের আবেদন সার্বিক যন্ত্রণার যুগে ম্লান হয়ে আসে। মধুররস

ও পরকীয়া সাধনার বিকৃতিতে ব্যাভিচার সমাজে সৃষ্টি করেছিল প্রতিক্রিয়া। উপরন্তু কৃষ্ণ বা চৈতন্যকে বাস্তব জীবনে সমস্যা জানানো 'হেতুভক্তি' হিসাবে নিন্দিত হতো। মোঘল শাসনের অবসানের মুহূর্তে বর্গীয় আক্রমণ, নানা দস্যুর অত্যাচার, খাজনার উৎপীড়নে বেঁচে থাকা দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। এসব দেবীর নেতিবাচক লীলা হিসাবে দেখে ভক্ত, তারই কাছে এর প্রতিবিধান চেয়েছিল। তিনিও উমা-মেনকা-হিমালয় রূপে জীবনের এ তিক্ততা ভোগ করেন। ভক্তি আন্দোলনের প্রভাবে দেবতা মানবায়িত হয়ে ছিল। ভক্ত তার সঙ্গে স্থাপন করেছিল মানবিক সম্পর্ক। আদিশক্তি জায়া-জননী-কন্যা রূপে লীলা করেন। ভক্তকে স্নেহ প্রেমে মায়াবদ্ধ করেন, আবার মায়ামুক্ত করেন। বীরাচার তন্ত্রে জায়া রূপে সাধনা ছিল। কিন্তু সাংসারিক মানুষ বাৎসল্যে কন্যারূপে এবং মাতৃরূপে দেবীকে চেয়েছিলেন। মায়ের আশ্রয়ে ফিরে যাওয়া, রূঢ় জীবনের সমস্যা থেকে এক নিরাপদ প্রত্যাবর্তন ছিল। বঙ্গের মায়ের সঙ্গে সম্পর্কে ব্যাভিচারের কোনো সম্ভাবনা নেই; স্বার্থবুদ্ধি নেই। দেশ, ভাষা সবই মাতৃসম্পর্কে চিহ্নিত হয়। সমস্যা এড়িয়ে বৈষ্ণব বৈরাগি হয়ে তখন পালাবার জায়গা ছিল না। মানুষ দুঃখকে স্বীকার করে, শক্তি সঞ্চয় করে থারের সাগর লঙ্ঘন করতে চেয়েছিল। পরবর্তী ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে ভবানী/ কালিকা প্রেরণা দিয়েছিলে।

অষ্টাদশ শতকে বর্ধমানের রাজা, নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রমুখ শাক্ত ঐতিহ্যের সমর্থক হিসাবে রচয়িতাদের উৎসাহ দিয়েছিলেন। তাঁরা নিজেরও শাক্তপদ রচেছিলেন।

শাক্তগানের একাংশ আগমনী বিজয়ার গান, অন্য অংশে দেবীর রূপ-স্বরূপের ব্যাখ্যান এবং ভক্তের আকুতি। শিব পার্বতীর পুরাণ কথা বঙ্গের হিন্দু উচ্চবর্ণের কুলনী প্রথা, বহু বিবাহ প্রথা, বধূ উৎপীড়ন প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক সামাজিক দলিলে পরিণত হয়েছে। এখানে হিমালয়ের ছেলে মৈনাক আত্মহত্যা করে; নিরুপায় কুলীন দম্পতি বৃদ্ধ, নেশাখোর, ভিখারি শিবের সঙ্গে আট বছরের মেয়ের বিয়ে দেয়। গৌরীর গয়না নেশারু স্বামী বেচে দেয়। নির্যাতনে, অনাহারে গৌরী কালী হয়ে, উন্মাদ হয়ে শ্মশানে ঘুরে বেড়ান, মদ খান। রক্তসম্পর্কে বিয়ে না হওয়ায় হিন্দু উচ্চবর্ণের মেয়েরা গ্রাম পরিজন ছেড়ে দূরে যেত। সেকালের দুর্গাপূজার সময় মেয়েরা আসতো মায়ের কাছে। দুর্গাপূজা ছিল মেয়েদের পুনর্মিলন উৎসব। এ পটভূমিকায় আগমনী বিজয়ার গান এক অনবদ্য শিল্পরূপে পেয়েছে। দীনেশ চন্দ্র সেন চমৎকার করে বলেছেন যে আশ্বিনের ঝরা শেফালির মতো মায়ের কাছে আসার জন্য বালিকা বধূদের অশ্রুজলে রচিত আগমনী বিজয়ার গান, 'তৎকালীন বঙ্গজীবনের জীবন্ত বিচ্ছেদ রসে পুষ্ট।'

১৯.৪ রামপ্রসাদ সেন

রামপ্রসাদ সেন (১৭২০-১৭৮১)—চব্বিশ পরগনার হালিশহর কুমারহট্টে পিতার দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান রামপ্রসাদের জন্ম হয়। তার দু'ছেলে, দু'মেয়ে ছিল। প্রথম জীবনে তিনি কলকাতার কোনো এক জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করতেন। পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাকে নিষ্কর জমি দেন; দেন কবিরঞ্জন উপাধি। রামপ্রসাদ গ্রাম ছেড়ে রাজসভায় যাননি। দারিদ্র্যও তাকে ছেড়ে যায়নি। গ্রামে তার গানের প্যারোডি রচতেন বৈষ্ণব আজু গোঁসাই। দ্বিজ রামপ্রসাদ এবং কবিয়াল রামপ্রসাদের রচনা তার গানে মিশে আছে। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর জীবনী ও গান সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর রচিত তিনশত গান সংগৃহীত হয়েছে।

কালী কীর্তন (বিদ্যাসুন্দর) এবং কৃষ্ণকীর্তন নামে তাঁর দু'টি ক্ষুদ্র কাব্য রয়েছে। কিন্তু তাঁর খ্যাতি মূলত শাক্ত পদাবলির ভগীরথ হিসাবে। রামপ্রসাদ বাংলা গানের বিশিষ্ট এক রীতির স্রষ্টা। রামকৃষ্ণদেব যথার্থই বলেছেন, 'রামপ্রসাদ গানে সিদ্ধ।' তাঁর গান ছিল তাঁর সাধক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

তাঁর রচিত শাক্ত গানকে (১) আগমনী-বিজয়া (২) দেবীর স্বরূপ (৩) সাধন তত্ত্ব (৪) দেবীর রূপ (৫) ভক্তর আকূতি প্রভৃতি বিভাগে ভাগ করা হয়।

কুলীন প্রথা, গৌরীদান, বহুবিবাহ, সামাজিক অবক্ষয়ের পটভূমিকায় হিমালয়-মেনকা-গৌরী-শিবের চূর্ণ কাহিনি রূপ পেয়েছে আগমনী-বিজয়ার গানে। মেয়েকে আনার জন্য, দেখার জন্য মা এবং মেয়ের যন্ত্রণা আগমনী গানের বিষয়। বিজয়ার মেয়ে এসে তিনদিন থেকে চলে যায়, সুবর্ণপ্রতিমা বিসর্জিত হয় জলে। মায়ের কাঁদনে চারপাশ যন্ত্রণাক্ত হয়। এবিষয়ে কবির পদ কম হলেও তা বাৎসল্য রসে এবং বঙ্গের সমাজচেতনার প্রক্ষেপে অসাধারণ।

দেবীর রূপ এবং স্বরূপ বর্ণনায় তাঁর কৃতিত্ব আছে। নানাভাবে দেবীর রূপ ও স্বরূপ বর্ণনার পর তিনি লিখেছেন—

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে
মা বেটী কি মারি মেয়ে মিছে ঘাটি মাটি নিয়ে।।

সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা মুক্ত হয়ে তিনি শ্যাম-শ্যামাকে অভিন্ন করেছেন। এ মুক্ত বুদ্ধির পথে রামকৃষ্ণের আবির্ভাব।

রামপ্রসাদের স্মরণীয় রচনা হল তার ভক্তর আকূতি। এ পর্যায়ে দেবীকে সাক্ষাৎ গর্ভধারিনী করে গ্রাম্য বালকের মতো কবি তাকে আনন্দের লোভ দেখিয়ে দুঃখসাগরে নিমগ্ন করার জন্য অভিযুক্ত করেছেন। জীবনের সমস্যা নিয়ে তার সঙ্গে কলহ করেছেন। কিন্তু অন্তে কালভয় হরণে তারই শরণ নিয়েছেন। উকিল ও কর্মচারী, মূল্যবোধহীন সমাজের এ গান এক গুরুত্ব পূর্ণ তথ্যচিত্র। এখানকার গ্রামীণ জীবন চিত্তে কাল্পনিকতা নেই। বাস্তব গ্রামের নিম্নবর্গের 'অঙ্গবিন্যাসে রক্তমাংস উঠিয়া যায় নাই।' বৈষ্ণব বাৎসল্যে বৃহত্তর আর্থসামাজিক পটভূমিকা না থাকায়, রামপ্রসাদের বাৎসল্য রসের পদ তুলনায় জীবন্ত এবং গভীর। তার গান শুধু বৈকুণ্ঠের জন্য নয়, বাস্তবের ধূলায় তার আসন পাতা। এ পর্যায়ের পদে তত্ত্ব, বাস্তবতা এবং কাব্যরসের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছে। তাঁর কাব্য মানব জমিনে সোনা ফলানোর অন্য নাম।

নিরাভরণ কথ্য ভাষাভঙ্গী এবং লৌকিক ছন্দে রামপ্রসাদের পদ, এসময়কার সালঙ্কার কাব্যভাষা থেকে ভিন্ন স্রোত নির্মাণ করেছে। তার কাব্যভাষায় প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার বাক্যকে কাব্য করে জীবন ঘনিষ্ঠ করেছে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'যে তার জীবনের অনেক গল্প নিয়ে তিনি লোকজীবনে বেঁচে আছেন। 'তাঁর গানগুলি উদার আকাশের মত বিশাল, সরল সুরের হাওয়ায় মন্ত্রের সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা বিক্ষোভ বিদ্বেষ দূর করে দেয়।'

ফার্সি ইংরাজি শব্দ দিয়ে নষ্ট বিচার ব্যবস্থাকে বর্ণেন তিনি—

আমায় ফিকিরে ফকির করে বসে আছ রাজকুমারী
হুজুরে উকিল যে জমা ডিসমিশে তার আশায় ভারি।
করে আসল সন্ধি, সওয়াল বন্দি, যে রূপে মা আমি হরি।।
পালাইতে স্থান নাই মা, বল কিবা উপায় করি।
ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ—তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি।।

তত্ত্ব কথাকেও তিনি বাস্তবের উপমায় জীবনের সঙ্গে যুক্ত করেন—

ডুব দে মন কালী বলে
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে
... ...
তুমি দম সামর্থে এক ডুব যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে।।
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।

তুমি ভক্তি করে কুড়ায়ে পাবে শিব যুক্তি মতন চাইলে।।
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে আহার লোভে সদাই চলে
তুমি বিবেক হল্‌দি গায়ে মেখে যাও
ছোবে না তার গন্ধ পেলে।।

একক : ২০ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

বর্ধমানের কালনা গ্রামে আঠারো শতকের শেষার্ধে কমলাকান্তের জন্ম। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে পঞ্চাশ বছর বয়সে তার দেহাবসান ঘটে। বাল্যে পিতৃহীন হয়ে তিনি বর্ধমানের চান্নায় মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। টোলে শিক্ষান্তে তিনি টোলে শিক্ষকতা করতেন, তান্ত্রিক সাধনা করতেন এবং শাক্তগান লিখতেন। বর্ধমানের রাজাদের তিনি সভাপণ্ডিত এবং গুরুস্থানীয় ছিলেন। প্রথম জীবনে 'সাধকরঞ্জন' নামে এক তত্ত্বকাব্য লিখেছিলেন তিনি। মৃত্যুর পর কমলাকান্তের প্রায় তিনশ পদের এক গ্রন্থ মুদ্রিত করেছিলেন বর্ধমান রাজারা। কমলাকান্তকে নিয়ে লোককাহিনি প্রচলন আছে।

শাক্তগানের আগমনী বিজয়া পর্যায় সূচিত করেছিলেন রামপ্রসাদ। বহুপদ লিখে এ পর্যায়টিকে সুগঠিত করে পূর্ণতা দেন কমলাকান্ত। বাৎসল্য শাক্ত ঐতিহ্যের প্রধান রস। একে সাময়িক সমাজচিত্রের সঙ্গে মিশিয়ে জটিল এবং বিচিত্র পূর্ণতা দেন কমলাকান্ত। প্রবীণ মেনকা-হিমালয়ের ধনজন হীনতা, অসহায়তা; হিমালয়ের বাঙালি পুরুষের মতো আলস্য ও উদ্যোগ হীনতা দেখিয়েছেন কমলাকান্ত। এ দম্পতির ছেলে মৈনাকের অকালমৃত্যুর ফলে একমাত্র মেয়ের প্রতি আকর্ষণ বেড়েছিল মেনকার। বৃদ্ধ, দরিদ্র স্বামীর ঘরে, সতীনের সঙ্গে দিনযাপনে বালিকা গৌরীর দুর্দশার কথা স্মরণ করেন মেনকা। মেয়ে না আনার জন্য প্রতিবেশীরা দেয় খোটা। লোকমুখে ভেসে আসে মেয়ের নানা দুঃসংবাদ। স্বামী ছাড়া কেউ নেই মেনকার কথা বলার। তার দিন কাটে দুর্ভাবনায়, রাত কাটে দুঃস্বপ্নে।

আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে।
গিরিরাজ অচেতনে কত ঘুমাও হে।
এই এখনি শিয়রে ছিল গৌরী আমার কোথা গেল
আধ আধ মা বলিয়ে বিধুবদনে।।
মনের তিমির নাশি উদয় হৈল আসি
বিতরে অমৃতরাশি সুললিত বচনে।
অচেতনে পেয়ে নিধি চেতনে হারালাম গিরি হে
ধৈরয় না ধরে মম জীবনে।।
আর শুন অসম্ভব—চারিদিকে শিবা রব হে
তার মাঝে আমার উমা একাকিনি শ্মশানে।
বল কি করিব আর কে আনিবে সমাচার হে
না জানি মোর গৌরী আছে কেমনে।।

এ যন্ত্রণার পদেও কবি তত্ত্ব মিশিয়েছেন অনায়াসে। বৈষ্ণব পদকর্তার মতো ভণিতায় মেনকা গৌরীর লীলা কাহিনিতে অংশ নিয়ে প্রবোধ দিয়েছেন মেনকাকে। স্বপ্নে মেয়ে বরণ আভরণ হারিয়ে কালিকা রূপে দেখা দেন। ধ্যানে ইষ্টকে পেয়ে চেতনে তাকে হারিয়ে হাহাকারের মধ্যে মিশে যায় সাধন তত্ত্ব আর মাতৃশোক।

মেনকা বারবার মেয়ে আনতে বলে স্বামীকে, তার আর্তনাদে মিশে যায় সে সময়ের তাবৎ নারীর যন্ত্রণা—

'কামিনী করিল বিধি তেই হে তোমারে সাধি
নারীর জনম কেবল যন্ত্রনা সহিতে।'

বিজয়া পর্বে মেয়ে এসে প্রতি-অনুযোগ করে, স্বামী ঘরের দারিদ্র্য গোপন করে, নিজের গর্ব করে। দেখতে দেখতে বিজয়ার মরণশেল আসে। বসুধালিঙ্গন করে মায়ের হাহাকারে ভরে যায় চারদিক। এ পর্বগুলির বিস্তারিত পদ লিখেছেন কমলাকান্ত।

দেবীর রূপ ও স্বরূপ বর্ণনায় তিনি দক্ষতা ও কাব্য কুশলতা দেখিয়েছেন। শ্যাম শ্যামাকে তিনি একাকার করেছেন। মনমোহিনী এলোকেশী কালী তার পদে অপরূপা। কমলাকান্ত মৃত্যুরূপা কালীর বর্ণনায় মাধুর্য এনেছেন। তার ভয়ঙ্করী রূপকে শুভঙ্করী করেছেন। ভক্তের আকুতিতেও তিনি বিশিষ্ট—

'মজিল মনভ্রমরা কালীপদলীন কমলে
যত বিষয়মধু তুচ্ছ হৈল কামাদি কুসুম সকলে।'

তিনি,

'কভু বজ্রপুরে আসি বাজাইয়ে বাঁশি
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়।'

রামপ্রসাদের কাব্যভাষা ছিল সহজ, সরল, অপ্রসাধিত। সে তুলনায় কমলাকান্তের ভাষাও ছন্দ মার্জিত, সংহত, সংযত। তিনি সাধক; কিন্তু সচেতন শিল্পীও বটে। কিন্তু তার ভাষায় অষ্টাদশ শতকীয় নিষ্প্রাণ অলঙ্কারের মল্লক্রীড়া নেই। রামপ্রাদের মতোই তিনি একজন স্মরণীয় কবি-সাধক। পরবর্তীকালে গিরিশ চন্দ্র, মধুসূদন, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ বহুজন শাক্তপদ লিখছিলেন।

২০.১ সংক্ষিপ্তসার

বৈষ্ণব পদাবলির পরবর্তী যুগে আখ্যানমূলক শিব-পার্বতী-দুর্গা-কালিকার কথা চূর্ণ কবিতার রূপ নেয়। এ রচনাবলি শাক্ত পদাবলি/ মালসী গান হিসাবে প্রসিদ্ধ। প্রাচীন প্রকীর্ণ পদ পাওয়া গেলও বাংলায় রামপ্রসাদ শাক্ত গানের ভগীরথ। 'প্রসাদী সুর' বাংলা ভক্তিগানের এক উজ্জ্বল সৃষ্টি। বাস্তব জীবনের ছোয়ায়, সহজ সারল্যে, দেবতাকে প্রিয় করার রামপ্রসাদ অনন্য এক স্রষ্টা।

তাঁর অসমাপ্ত সৃষ্টিকে পূর্ণ বিকশিত করে তোলেন কমলাকান্ত। সাধক কমলাকান্ত ছিলেন সচেতন স্রষ্টা। তাঁর রচনায় তত্ত্ব কাব্য হয়ে উঠেছে।

ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে শাক্ত ঐতিহ্য ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রেরণা হয়ে ওঠে। মুকুন্দ দাস, নজরুল শাক্ত পদে জোয়ার আনেন। অষ্টাদশ শতকে বহু কবি শাক্ত পদ লিখেছিলেন। মধুসূদনের বিজয়া পর্যায়ের সুন্দর পদ আছে।

২০.২ অনুশলনী

বিস্তৃত বিশ্লেষণাত্মক উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন—

১। বাংলা সাহিত্যে রামপ্রসাদের অবদান বিশ্লেষণ করুন।

২। শাক্ত পদাবলির সফল কবি হিসাবে কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের বিচার করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন—

১। রামপ্রসাদের 'ভক্তের আকুতি' পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

২। 'আগমনী' পর্যায়ের গানে কমলাকান্তের গুরুত্ব নির্ণয় করুন।

একক ২১-২২ ❐ বাউল গান, লালন সাঁই, হাসন রাজা, দুদ্দু সা

গঠন

২১-২২.১ উদ্দেশ্য
২১২ প্রস্তাবনা
২১.৩ বাউল গানের বিষয় ও বৈশিষ্ট্য
২১.৪ লালন সাঁই
২২.১ দুদ্দু সা—জীবন ও রচনা
২২.১ হাসন রাজা
২২.৩ সংক্ষিপ্তসার
২২.৪ অনুশীলনী

২১-২২.১ উদ্দেশ্য

বাউলদের নিয়ে নানা জিজ্ঞাসার উত্তর হিসাবে এ পর্যায়টি পড়া যেতে পারে। চর্যাপদের কাল থেইে বঙ্গ সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বাউলদের দেখা মেলে। তারপর এখানে এসে মিশেছে বেসরা সুফিদের মধ্যপ্রাচ্যের নানা সমধর্মী ঐতিহ্য। সমন্বয় এবং মানবতা বোধ, ইহদেহবাদ বাউল দর্শনের মূলকথা। তাদের বিষয়ে সাধনার বিষয়গুলি এ পর্যায়টি পাঠ করলে জানা যাবে।

জানা যাবে লোক জীবনের মহাকবি লালন সাঁই-এর পরিচয়। তাকে তুলে ধরায় রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা এবং রবীন্দ্রসাহিত্যে লালনের প্রভাব নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

লালনের শিষ্য দুদ্দুসা'র তীব্র সমাজচেতনা বাউল ভুবনের আরেক দিগন্তকে উন্মোচিত করেছে।

বাঙালি বাউল হাসন রাজা আরেক বর্ণময় চরিত্র এবং বঙ্গের অন্যতম লোক দার্শনিক। তার পরিচয় মিলবে এ পর্যায়টিতে।

২১.২ প্রস্তাবনা

অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে এক ধরনের সাধক সম্প্রদায় বাউল সংগীত রচনা করেন। এগুলো মূলত আধ্যাত্মিক পর্যায়ের গান। বাংলার সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট সম্পদ উৎকৃষ্ট এই বাউল সংগীত। বাউল সাধক সম্প্রদায় ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা। তারা ঈশ্বরের ভাবরসে মাতাল। কেউ কেউ বাউলদেরকে বায়ুরোগ গ্রস্ত বলে থাকেন। বাংলাদেশের বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়, বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়, সুফি আউলিয়া সম্প্রদায় এবং আরও অনেকের সাধনা এই বাউলগান। রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিশিষ্ট বাউল সাধক লালন ফকিরের গানকে আমাদের সামনে নিয়ে আসেন। 'যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তাহা আছে দেহভাণ্ডে'—এটাই বাউল সাধনার মূল কথা। লালনের গানে আধ্যাত্মিক আদর্শ আছে, তবে তাঁর বলিষ্ঠ ভক্তিচেতনা মানুষকে মূল্য দিয়েছে। লালনের মতোই অধ্যাত্মমার্গের বাউল সাধক ছিলেন হাসন রাজা, দুদ্দুসা। এরাও কিছু উৎকৃষ্ট বাউল গান রচনা করেছেন। লালন লোকজীবনের মহাকবি, লালনের প্রিয় শিষ্য দুদ্দুসা বাউলগানের প্রচারে ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন আর রবীন্দ্রনাথের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় হাসন রাজা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সব মিলিয়ে বাউলগান বাংলা দেশের এক বিশিষ্ট সাহিত্য সংগীত।

২১.৩ বাউল গানের বিষয় ও বৈশিষ্ট্য

বৌদ্ধ ঐতিহ্যের বজ্রকুল-রক্তকুল-বৈতুল্যবাদী, শৈব-বৈষ্ণবের বাতুল বেসরা সুফিদের আউল এবং সমোচ্চারিত বহু শব্দ বাউল শব্দে আশ্রয় নিয়েছে। শব্দটির মধ্যে রক্ষণশীলদের অবস্থা এবং সাধকদের প্রতিবাদ মিশে আছে।

বাউল বাংলার গুরুত্বপূর্ণ এক লোকধর্ম এবং জনপ্রিয় লোকগান। রক্ষণযোগ্য মূল্যবান শিল্প হিসাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাউলগান স্বীকৃত হয়েছে। দু'বঙ্গের প্রায় সর্বত্র হিন্দু-মুসলমান খ্রিস্টান সমাজে বাউল, ফকির, সাধু, শব্দগান, ভাবগান, মালজোড়া, বিচারগান, তুক্কা প্রভৃতি ভিন্ন নামে আউল, বাউল, ফকির, দরবেশ, সাঁই প্রভৃতি নানা পরিচয়ে এ মতের সাধক এবং গায়কদের খুঁজে পাওয়া যায়। এদের রচিত পদাবলি এবং সাধনার পুঁথি বঙ্গভাষার একক বৃহত্তম সম্ভার। এখানে হিন্দু মুসলমানের নর-নারীর বা তদ্‌বিপরীতে গুরুশিষ্য হয়। এটি পৈতৃক ধর্ম নয়, গুরুজাতীয় ধর্ম। যে কোনো ধর্ম-বর্ণের নরনারী গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে এক দলে পরিণত হয়। জাতবর্ণ সাম্প্রদায়িক বিভাগ, বৈদিক/ শরিয়তি আচার বাদ দিয়ে এখানে গুরুদের সদাচারে জীবন যাপিত হয়। প্রচলিত সমাজে শিথিলভাবে সংযুক্ত থেকে অথবা গোপনে অনেকে বাউল চর্যা পালন করে। অনেকে ভেক সন্ন্যাস নিয়ে (খেলাফতি) খানকা বা আখড়ায় আলাদা জীবন যাপন করে। এ জীবনে সাম্প্রদায়িক বিভেদ বা আচার মানা হয় না। তারা বেদ/শরিয়ত বিরোধী জীবনযাপনে বেশ, খাদ্য, চর্যায় বিশিষ্ট। অন্তরঙ্গ গোপন সাধনায় তারা দেহমনকে বদলান। এ বদলে তারা আত্ম সর্বস্বতা ছেড়ে সবার সঙ্গে মিলে, অন্যকে সুখী করে, এক নিন্দা হিংসামুক্ত শান্ত জীবন যাপন করতে চান। দেহের রোগ এবং মনের শোক নাশ করে বাউল সাধনা। বাউল তত্ত্ব শাস্ত্রনির্ভর বিশ্বাসকে বলে অনুমান। কেননা কল্পিত ঈশ্বর, পূর্ব-পরজন্ম ইত্যাদি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে প্রমাণিত হয় না। তারা প্রামাণ্য ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বিষয় বা তত্ত্বকে মানে। তা হল বর্তমান। বাউল বর্তমান মানে, অনুমান মানো। তারা ভারতীয় লোকায়াত দর্শনের অনুসারী। তারা ইহদেহবাদী; গুরুবাদী। কল্পিত ঈশ্বর বা দেব-দেবতা নয়, বাউল মানুষের সেবাপূজা, উপাসনা করে। চৈতন্যের সর্বত বিকাশ মানবদেহে, তাই মানুষ সবার উপরে। দেহের চৈতন্য সত্তাকে দেখতে, জানতে ও বুঝতে চায় তারা। পার্থিব বস্তুসম্ভারে নয়, মহাসুখ নিহিত থাকে মানবীয় সম্বন্ধে। মরণশীল জীবনে এ আনন্দের অমৃতকে তারা খোঁজে। দেহে মনের মানুষকে, স্রষ্টাকে খোঁজার অন্য নাম বাউল সাধনা। মন্দির মসজিদে না গিয়ে তারা দেহকে শুদ্ধ করে দেবালয় বানায়।

বঙ্গে বাউলের কোনো নির্দিষ্ট কেন্দ্র, কর্তৃত্ব, আচার-অনুষ্ঠান নেই। নানা ছোট ছোট দল নানা ভিন্ন নামে, সাজপোশাকে, বাদ্যযন্ত্রে, নৃত্য গীতরীতিতে দেশের সর্বত্র দৃশ্য হয়। বড় মেলা, মহোৎসবে, সাধুভাষায় এরা সমবেত হয়। নানা বর্ণের গাভীর মতো বাইরে বাউলদের বহু বৈচিত্র্য। কিন্তু অন্তরঙ্গে বহুবর্ণ গাভীর এক বর্ণ দুধের মতো মানুষ ভজনার ঐতিহ্য এদের। ধর্মের আচার, বিধি, জাতবর্ণ বিভাগ অগ্রাহ্য করে তারা মানুষকে এক জাতি বলে প্রচার করে। ইহদেহের মহিমা গায়।

আউল, বাউল, ফকির, দরবেশ, সাঁই প্রভৃতি নানা ভিন্ন নামে এদের চিহ্নিত করা হয়। এ নামগুলিকে অনেকে সাধনার স্তর বলে থাকেন। অনেকে চারভূতের কোনোটিকে বেশি গুরুত্বের চিহ্ন কলে এ নামকে দেখে থাকেন। নাথ, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, সুফি, বৈষ্ণব ঐতিহ্যের সঙ্গে সহবাসিতার নানা চিহ্ন বাউলের মতাদর্শে আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু এসব ধর্মশাস্ত্রের প্রসঙ্গ বা চরিত্রগুলি বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহার করে সাধক। প্রাগুক্ত সম্প্রদায়ের একটিও নয় বাউল। তারা বঙ্গের এক স্বাধীন লোকতন্ত্র। বাউলের আখড়ায় সুফি বৈষ্ণবে হয় কোলাকুলি। বাউল গানে বাঙালি মনের নিভৃত ভুবনের গোপন দ্বার খুলে যায়।

শাস্ত্রীর ধর্ম আচারের ভিত্তিতে মানুষকে খণ্ড করে। আচার মুক্ত বাউলেরা বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায়, ভাষা, লিঙ্গ বিভাজন অগ্রাহ্য করে মানুষকে এক জাতি বলে। স্বল্প উপাদানে, দেহকে নীরোগ রেখে বাউল জীবনকে বাসযোগ্য করে তুলতে চায়। কিন্তু শাস্ত্রীয় ধর্ম, ব্যক্তি স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে, এককে অন্যের চাইতে বেশি ভোগে প্রবৃত্ত করায়। এতে একে অন্যকে বঞ্চিত, শোষণ করে। ফলে হিংসা এবং রণরক্তের পরিবেশ তৈরি হয়। কিন্তু ভোগের পদ্ধতি না জেনে, রিপুইন্দ্রিয়ে তাড়নায়,মনের অতৃপ্তিতে ব্যক্তি পৌঁছায় যমের দুয়ারে। কাম হরণ, ধ্বংস মত্ত হয়। দেহ ক্ষয় করে নির্বিচারে বহু সন্তানের জন্ম দেয়।

এ দুনিয়াদারীর বিরুদ্ধে ইমানদারীর, আসমানদারীর প্রস্তাব দেয় বাউল। রচনা করে হিংসার বিরুদ্ধে প্রেমের সনদ।

২১.৪ লালন সাঁই

লোকজীবনের মহাকবি লালন সাঁই রবীন্দ্র-নজরুলের মতোই দু'বঙ্গর সংস্কৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। বাংলাদেশের তিনি গণ অধিনায়ক। ছেউড়িয়ায় তাঁর সমাধি বাংলাদেশের অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান। দোলের সময় এখানে এক মেলা বসে এবং উৎসব হয়। শ্বেত পাথরের সমাধি সংলগ্ন বিশাল গৃহে তার নামে স্থাপিত হয়েছে গবেষণাগার।

লালনের গুরু সিরাজ সাঁই ছিলেন পালকিবাহক। হরিশপুরে ছিল তাঁর নিবাস। সেখানে তার মাজার আছে। তিনি লালনকে ভেক সন্ন্যাস দেন। সন্ন্যাসীরা তাদের পূর্ব জীবনের কথা বলেন না। লালনও তার শিষ্যেরাও বলেননি। ফলে তার জন্ম তারিখ, জন্মস্থান, পারিবারিক পরিচয় নিয়ে মতভেদ শোনা যায়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সমসময়ে কোনো এক বছরে (১৭৭২/১৭৭৪) কুষ্টিয়ার ভাড়ারা/চাপড়া গ্রামে হিন্দু পরিবারে তার জন্ম। বাল্যে তার পিতার মৃত্যু হয়। মা-বাবার একমাত্র সন্তান লালনের বিয়ে হয়েছিল অল্প বয়সে। বহরমপুর/ নবদ্বীপ/ খেতুরী মেলায় গিয়ে তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। মৃত ভেবে সঙ্গীরা তাকে নদীতীরে বিসর্জন দিয়ে চলে আসে। মৃত ধরে নিয়ে মা-বৌ তার শ্রাদ্ধশান্তি করে। ওদিকে প্রায় মৃত লালনকে সিরাজ সাঁই বাড়িতে এনে চিকিৎসায়, সেবায় সুস্থ করে তুলেন। অনেক পরে গ্রামে ফিরলে মুসলমানের বাড়িতে অন্নজল গ্রহণের অপরাধে হিন্দুসমাজ তাকে জাতিচ্যুত করে। মা-বউও তাকে স্বীকার করতে পারেনা। লালন ফিরে আসে গুরুর কাছে এবং ভেক ফকিরি দীক্ষা নেয়। গুরু, লালন, লালনের শিষ্য হিন্দু বা মুসলমান সমাজ থেকে এসেছিল। কিন্তু কোনো ধর্ম গোষ্ঠীতেই সামিল ছিল না। নানা দেশ ঘুরে লালন কুষ্ঠিয়ার ছেউড়িয়ায় আশ্রম বানান। জোলা সম্প্রদায় তার সমর্থক ছিল। আশ্রমে জীবনসঙ্গিনী লালমোতি, ধর্মকন্যা পিয়ারী, তার স্বামী ভোলাই এবং অন্যান্য শিষ্যেরা থাকত। গান, কবিরাজি চিকিৎসা, সামান্য চাষ ছিল তার পেশা।

শতাধিক বছরের জীবনে তিনি সাধক, গায়ক, পদকর্তা হিসাবে খ্যাত হয়ে, দশ হাজারেও বেশি অনুগামী পান এবং শরিয়ত ও বেদের বিধিবিধান বাতিল করে মানবমণ্ডলি গঠন করেন। মধ্যবঙ্গের সমাজ-সংস্কৃতি আন্দোলনের তিনি অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠেন। তিনি হিন্দু বা যবন পরিচয় দিতেন না। ১৮৯০-এর ১৭ অক্টোবরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পর তার নির্দেশমত মৌলবী বা পুরোহিত ছাড়াই সাধুর রীতিতে তার সমাধি হয়। পারলৌকিক ধর্মাচারের পরিবর্তে হয় গানের মহোৎসব। সম্পত্তির বিভাগে বড় অংশই দিয়ে যান স্ত্রী ও মেয়েকে। সাম্প্রদায়িক আচার বর্জনের এ দৃষ্টান্ত সেকালে ছিল অকল্পনীয়। সমকালীন বিদগ্ধ জনেরা তাকে চিনতেন। খ্যাতকীর্তি গায়ক লালনের পদ ধর্মবাণীর মর্যাদা পেত। তার সহস্রাধিক পদের কথা শোনা যায়। কিন্তু তার এত পদ পাওয়া যায়নি। পূর্ব পাকিস্তান পর্বে তার নামে ইসলামি জাল পদ রচিত হয়েছে, পদের শব্দ

বদলানো হয়েছে, লেখা হয়েছে জাল জীবনী। লালন বিষয়ক জাল রচনা তখন ছিল এক বড় শিল্প (রাহুল পিটার দাস)।

লালনের পদাবলির অনন্যতা আকর্ষণ করেছিল বহুজনকে। ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিকেরা তাকে নিয়ে লিখেছিলেন। তার গানের আদিসংকলন ছিলেন নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং হরিনাথ মজুমদার। কুমারখালির জনউডরফের মান্যতান্ত্রিক কেন্দ্রটির সঙ্গে যুক্ত হরিনাথ মজুমদার ছিলেন গ্রামবার্তা প্রকাশিকার সম্পাদক। ঠাকুর জমিদারদের প্রজা পীড়নের তথ্য প্রকাশের দায়ে তিনি দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক আক্রান্ত হলে, সশিষ্য লালন তাকে রক্ষায় এগিয়ে যান। লালন, দুদু, পাঞ্জু, গোসাই গোপাল বা তাদের অনুরাগীরা ঠাকুর জমিদারদের প্রজা ছিলেন। তারা কোথাও দেবেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের কোনো শ্রদ্ধাযোগ্য উল্লেখ করেন নি। লালন ব্রাহ্মদের সমালোচনা করেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লালনের শেষ বয়সের এক ছবি এঁকেছিলেন। সরলাদেবী তার গান, স্বরলিপি এবং জীবনী প্রকাশ করেন পত্রিকায়। ইন্দিরা দেবী করেন লালনের গানের স্বরলিপি। রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে (১৩২২) লালনের বিশটি গান প্রকাশ করেন। সংগ্রহ করেন লালনের গানের প্রামাণ্য খাতা। ছন্দের আলোচনায় তিনি লালনের অসাধারণ ছন্দ এবং অসামান্য কাব্যভাষার আলোচনা করেছেন। ভারতীয় দর্শন শাখার অভিভাষণে (১৯২৫), মানুষের ধর্ম-এ লালনের গানকে উপনিষদের ঋষি এবং শেলির রচনার সমতুল্য মর্যাদা দিলেন। হারামণির ভূমিকায় আচার বর্জন করে কোরান পুরাণের সমন্বয়ের প্রবক্তা হিসাবে তিনি বাউলদের চিহ্নিত করলেন। খাঁটি বাউলদের আলোচনায় তিনি ঘুরে ফিরেই লালনের কথা বলেছেন। বহু স্বদেশি গানে তিনি বাউল সুর ব্যবহারের কথা স্বীকার করেছেন। তার প্রবন্ধ, নিবন্ধ, নাটক, কবিতা, গান, গল্প উপন্যাসে বাউলের প্রসঙ্গ এবং প্রভাব বহু বিস্তৃত। নাটকে তিনি বাউল ভূমিকা নিতেন। পত্রপুটের ১৫নং কবিতায় তিনি ঘোষণা করেছেন, 'কবি আমি ওদেরই দলে।'

সমকালে বিপুল খ্যাতির সমান্তরালে গোড়া হিন্দু এবং মৌলবাদী মুসলমানদের বিরোধিতা ছিল লালনের প্রতি। মৌলবাদী মুসলমানেরা লাগাতার লালনকে এবং শিষ্যদের মসী এবং অসি দিয়ে আক্রমণ করেছিল।

গান আর কবিতা, গ্রামীন জনতার বিচিত্তর বাকরীতির সঙ্গে ধ্রুপদী রীতি মিশে, হিন্দু-ইসলাম চরিত্র-কাহিনি-প্রসঙ্গ দিয়ে নির্মিত হয়েছিল তার কবিতার দেহমন। উত্তর-পূর্ব ভারতের তিনি মহান এক লোককবি। কথা ও সুরের জন্য লালনের গান বঙ্গের এক মহামূল্যবান শিল্পকর্ম। তন্ত্র, বৈষ্ণব ও ইসলামিতত্ত্বাদি, স্থাননাম নিজস্ব অর্থে ব্যবহার করেন তিনি যেমন—

আছে আছে আদি মক্কা এই মানুষ দেহে দেখ নারে মন ভেয়ে।
দেশ দেশান্তর দৌড়ে কেন এবার মরিস হাফিজ্।
করে অতি আজব ভাক্কা গঠেছেন সাঁই মানুষ মক্কা
কুদরতি নুর দিয়ে
ও তার চার দ্বারে চার নুরি ইমাম মধ্যে সাঁই বসিয়ে।।

চণ্ডীদাস, নিজামুদ্দিন আউলিয়া, শহীদ মনসুর হাল্লাজ, মস্কাবন্দী, সোহাসী সুফি, ভারতীয় ভক্তি আন্দোলনের নেতারা, শিব-কৃষ্ণ-চৈতন্য-হজরত মহম্মদ তার গানে স্থান নিয়েছেন। তার মতই, বিবাহিত বধূকে ঘরে রেখে নিঃসন্তান চৈতন্য, সমাজের বিরোধিতায় ফকিরি নেয়। লালনের চৈতন্য জামালকে দীক্ষা দেন, যবন রূপ সনাতনকে দেন গোস্বামী পদ। যবন হরিদাসের সমাধি দেন তিনি। তার 'নাই বেতের বোল, বলে হরিবোল লালনও 'জাতকে হাতে পেলে পুড়াতাম আগুন দিয়ে' বলেছেন। নবি-চৈতন্য-গুরু বন্দনা, দেহতত্ত্ব, মানুষতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, জাতবর্ণের বিরোধিতা, বৈদিকতা ও শরিয়তের সমালোচনা, প্রার্থনা, আত্মনিবেদন ইত্যাদি বিষয়ে তার

গান আছ। তার গানে কলিকাল, ভণ্ডসাধুরা সমালোচিত হয়েছে, ভিন্নব্যাখ্যা হয়েছে শাস্ত্রবচনের। লালনের রচনা সংযত, সংহত, বিচার বিতর্কে আলোড়িত। বহুপদে শোনা যায় তার দ্বিসত্তার কথোপকথন। তার কথা প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করে সাধকেরা।

১৯৯০ তে লালনের মৃত্যুর শতবর্ষ পালিত হয়েছে দু'বঙ্গে। তার নামে ঘোষিত হয়েছে পুরষ্কার। স্থাপিত হয়েছে মঞ্চ, সূচিত হয়েছে মেলা মহোৎসব। তাকে নিয়ে পুতুলনাচ, যাত্রা, নাটক, গল্প উপন্যাসে রচিত হচ্ছে। দুবঙ্গে এবং বহির্বিশ্বে লালনকে নিয়ে চলেছে বহুগবেষণা। তানভির মোকাম্মেল এবং গৌতম ঘোষ লালনকে নিয়ে অসামান্য সিনেমা তৈরি করেছেন। তার রচনা অনূদিত হয়েছে হিন্দি, ফরাসী, ইংরাজীতে। অকালে প্রয়াত ক্যারল সলমন, লালনের গানের অন্তর্নিহিত অর্থ নিষ্কাষণ করে ইংরাজীতে নূতন রীতির এক অনুবাদ করেছেন (City of Mirrors Songs of Lalan Sai, oxford university press,)। এ অনুবাদটি এক সৃজনশীল গবেষণা।

বঙ্গে হিন্দুসমাজের নগর কেন্দ্রিক নবজাগরণের সমসময়ে, হিন্দু-মুসলমান আপামর জনগণকে সাম্প্রদায়িক বিভেদমূলক ধর্মাচার, সঙ্কীর্ণ ভোগবাদ এবং ব্যক্তিগত সম্পদের অতিরেক বর্জন করে এক বাসযোগ্য সমাজ নির্মাণের ডাক দিয়েছিলেন লালন। ধর্ম-অর্থ-লিঙ্গ বৈষম্যহীন এখানে সবাই মানুষ। মানুষতত্ত্বই লালনের দর্শন। এ মানব জমিনে আজীবন আমরণ সোনা ফলাতে ব্যস্ত ছিলেন লালন সাঁই। ভারতীয় ভক্তিবাদের যুক্তিনিষ্ঠ ঐতিহ্যের তিনি ছিলেন সর্বোত্তম প্রতিনিধি। কল্পিত ঈশ্বর, দেবতা-অপদেবতা নয়, বাস্তব মানুষে ছিল তার অভিনিবেশ। হিংসা নিন্দার বিরুদ্ধশক্তি প্রেম, প্রেম মানুষকে মিলিত করে। লালনের দর্শনের, সাধনার মূলে মানুষ। মানুষ তার ভুবনের কেন্দ্রে। মানুষের পক্ষে হিতকর সব কিছু ধর্ম, আর অহিতকর বিষয়গুলিই হল অধর্ম। লালনের মনের মানুষ সাঁই, বাস্তব মানুষে মিশে থাকে। আর্শিনগরের পড়শীর মানুষের মত হস্ত—পদ-স্কন্ধ-মাথা-নাভি (নাই)। তিনি দ্বিপদ, দ্বিভুজ। দৃষ্টির আচ্ছন্নতায় আমরা জীবে শিবকে, আদমে আল্লাকে, মানুষে ক্রীড়ারত শ্যামরায়কে দেখতে পাই না। লালন বলেন, 'আমি একদিনো না দেখিলাম তারে'।

আমাদের সাম্প্রদায়িক রক্তে ভেজা দেশে, জাতবর্ণে শত ছিন্ন সমাজে, ভোগবাদে বিকৃত সংস্কৃতিতে, মানুষের দুর্দশা ও লাঞ্ছনার নিবিড় ঘন আঁধারে লালন এক উজ্জ্বল ধ্রুব নক্ষত্র।

তাঁর অতিখ্যাত পদ

- আমি একদিনো না দেখিলাম তারে।
  আমার বাড়ির কাছে আর্শিনগর এক পড়শী বসত করে।।
  সেই গ্রাম বেড়ে অগাধ পানি নই কিনারা তাই তরণী পারে
  মনে বাঞ্ছা করি দেখবো তারি কেমন সে গাঁয়ে যাই রে।।
  বলবো কি সেই পড়শীর কথা ও তার হস্তপদ স্কন্ধ মাথা নাই রে।
  ও সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর আবার ক্ষণেকভাসে নীরে।
  পড়শী যদি আমায় ছুঁতো যম যাতনা সকল যেতো দূরে
  সে আর লালন এক খানে রায় থাকে লক্ষ যোজন ফাঁকে রে।

- পাপ পুণ্যের কথা আমি কারো বা শুধাই।
  এদেশে যা পাপে গণ্য অন্য দেশে পুণ্য তা।।
  তিব্বত নিয়ম অনুসারে এক নারী বহু পতি করে
  এদেশেতে হলে ব্যাভিচারী দণ্ড তায়।

শুকর গরু দুইটি পশু খাইতে বলেছেন যিসু।
এখন কেন মুসলমান হিন্দু পিছেতে হটায়।।
দেশ সমস্যা অনুসারে ভিন্ন বিধান প্রচারে
লালন বলে বিচার কর্লে পাপপুণ্যের নাহি বালাই।
পুণ্য করলে স্বর্গবাসী, পাপ হলে ভবে আসি
লালন বলে নামে উদাসী নিত্য নিত্য প্রমাণ পাই।।

একক : ২২ দুদ্দু সা ও হাসন রাজা

২২.১ দুদ্দু সা—জীবন এবং রচনা

যশোহর জেলার হরিশপুরে বেতলা গ্রামে ঝড়ুমণ্ডলের ছোট ছেলে ছিলেন দরিরুদ্দিন বা দুদ্দু সা'। তাঁর মৃত্যু ১৯১১; জন্মকাল ১৮৪১, তবে এ নিয়ে বিতর্ক আছে।

বিদ্যালয়ের পাঠ এবং আর্বি-ফার্সি-সংস্কৃত ভাষার পাঠ নিয়েছিলেন তিনি। শিখেছিলেন বাউল এবং বৈষ্ণবতত্ত্ব। গ্রামে ছিলেন হিন্দু-মুসলমান সাধকেরা। হত তাদের যৌথ গানের আসর। এদের গান এবং তত্ত্বালোচনা শুনতে শুনতে বড় হচ্ছিলেন দুদ্দু। ক্রমে তিনি বিতর্কমূলক বাউল গানের দক্ষ শিল্পী হয়ে ওঠেন। সাধক লালন সাঁই-এর সঙ্গে গানের পালা করতে করতে তিনি লালনের শিষ্যত্ব নিয়ে গুরুর সঙ্গে ছেউরিয়া আশ্রমে দীর্ঘ সময় বাস করে শেষ জীবনে ফিরে আসেন বেলতলায়। তার উত্তরপুরুষেরা বাউল মত না নেওয়ায় তারা দুদ্দুর গানের খাতা, শিষ্য তালিকা কিছুই রক্ষা করেনি। এমন কি তার সমাধির চিহ্নিত প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল। এখন জীর্ণ অবস্থায় তার সমাধি রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামি মৌলবাদ তার নামে জাল লালনের জীবনী প্রচার করেছে। ঢাকা, বাংলা একাডেমি থেকে তার গানের সংকলন প্রকাশের সময় তার কোনো জীবনী মেলেনি। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও পাননি জীবনী। সাধক গায়কদের মধ্যে বেঁচে আছে দুদ্দু সার গান। রৌদ্রে জলে মরে নি তার রচনা;—আয়ু তার দুরন্ত লোহার। আমরা তার দু'শতাধিক গান উদ্ধার করে মুদ্রিত করেছি।

লালনের প্রিয় শিষ্য দুদ্দুর উপর লালনোত্তর কালের বাউলদের নেতৃত্বে বর্তেছিল। বিরোধীদের আক্রমণ প্রতিহত করে বাউল গানও সাধনা প্রচার ও প্রসারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। শরিয়তি ইসলাম এবং বিধিমার্গের বৈষ্ণবতার সঙ্গে, শাক্ত বৌদ্ধতন্ত্রের সঙ্গে বাউলের সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন তিনি। গুরু লালনের দুরূহ পদের ব্যাখ্যা পাই দুদ্দুর পদাবলিতে। সমকালীন দেশ, সমাজের সমস্যাকে, পরাধীনতাকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

তিনি আর্বি/সংস্কৃত ভাষার স্বর্গীয় দাবী নাকচ করে বঙ্গভাষার গৌরব ঘোষণা করে বলেছেন যে নব হজরত মহম্মদ এদেশে জন্মালে কোরান বাংলা ভাষায় লেখা হতো। গোড়া মুসলমানেরা গানকে হারাম বলে। এর বিরুদ্ধেই ইসলামি শাস্ত্র থেকে তিনি নানা তথ্য উদ্ধার করে গানকে বৈধ ঘোষণা করেছেন। মুসলমান সমাজের পিছিয়ে পড়ার জন্য ধর্মপালদের অবহেলা নয়, অতীত মুখীনতা, অতীতের বৃথা গর্ব, নিশ্চেষ্টতা, অদৃষ্টে বিশ্বাস, অলিখিত জাতি-বর্গভেদ, গোষ্ঠীগত দলাদলিকে দায়ী করে তিনি বঙ্গে মুসলমান সমাজ পুনর্গঠনের ডাক দিয়েছেন। হিন্দুসমাজে তিনি দেখেছেন বর্ণজাতিভেদ, মূর্খ ব্রাহ্মণ, মানুষকে ছোট করে প্রতিমা পূজার বাহুল্য, সতীদাহাদি প্রথা। তিনি দেখেছেন হিন্দু-মুসলমানদের অনৈক্যের ছিদ্রপথে ব্রিটিশ শক্তির অনুপ্রবেশ—

শুধু রে ভাই জাতাজাতির দোষে ফিরিঙ্গিরা রাজা হল এদেশে এসে।
হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান পরস্পরের হিংসায় দিল প্রাণ।
তাইতো পাদ্রি খ্রিস্টান যিশু খিস্ট্রের দ্বিন প্রকাশে।।
কোটি কোটি ভারতবাসী এক হয়ে রইল না মিশি
কয়জন ফিরিঙ্গি আসি, এদেশে জুড়ে বসে।।
হায় রে ধর্ম মানুষ জাতি এই কিরে তোর রীতিনীতি
লালন সাঁই কয় দুদ্দুর প্রতি ত্যজো জাত জাত নেশে।।

সাম্প্রদায়িক আচার বন্ধনগুলি ত্যাগ করে, দুদ্দু হিন্দু-মুসলমনকে এক মানববন্ধনে সামিল হওয়ার ডাক দিয়েছেন।

ব্রাহ্মণ এবং ধর্ম ব্যবসায়ীরা অদৃষ্টে দিয়ে দৃষ্ট সমাজ বৈষম্যকে যুক্তিসিদ্ধ করে, জাতপাত ধর্মে লিঙ্গে মানুষকে শত খণ্ডে ভাগ করে। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বর্তমানকে মান্যতা দিয়ে দুদ্দু কাল্পনিক অনুমানের এ সমস্ত অলীক তত্ত্ব বর্জনের ডাক দিয়েছেন। অদৃষ্ট, কর্মফল, পুনর্জন্ম, নিয়তি, জাতবর্ণের অবান্তর বিভাগ অগ্রাহ্য করে তিনি জনগণএক নিজের ভাগ্য নিজে গঠন করতে বলেছেন। মানুষকে তিনি একজাতি বলেছেন। নিজেকে হিন্দুমুসলমান না বলে তিনি মানুষ বলেছেন। জাত-বর্ণ-গোত্র চতুর মানুষের সৃষ্টি; প্রাকৃতিক বা ঐশ্বরিক নয়। এগুলি ভারতীয় ঐক্যের বড় বাঁধা।

নারী দুদ্দুর কাছে স্রষ্টা, মহিমাময়ী। তাকে লাঞ্ছনা বা পীড়ন করা অবৈধ, অধর্ম। তিনি মধ্যপ্রাচ্যের দরবেশী ঐতিহ্যের সঙ্গে বৌদ্ধ শাক্ততন্ত্র এবং বৈষ্ণবতার মিশ্রণে বাউল মতের উদ্ভব ব্যাখ্যা করেছেন। নিজেকে তিনি ইহদেহবাদী, বস্তুবাদী বলেছেন—

'যে খোঁজে মানুষে খোদা সেই তো বাউল
বস্তুতে ঈশ্বর খুঁজে পায় তার উল।।
পূর্ব পুনর্জন্ম না মানে চক্ষু না দেয় অনুমানে
মানুষ ভজে বর্তমানে, হয়রে কবুল।'

সেকালের বঙ্গদেশে দুদ্দুসা ছিলেন এক ব্যতিক্রমী কণ্ঠস্বর।

দুদ্দুর গানের ভাষা সংযত, সংহত, স্পষ্ট—প্রসাদগুণে ভরা। অশেষ দক্ষতায় তিনি বাউলদের গুপ্ত পরিভাষা ব্যাখ্যা করেন। ইসলামি তত্ত্ব, বৈষ্ণবতত্ত্ব, তন্ত্রের আলোচনায় তিনি নিপুন। নবি মহম্মদ এবং প্রভু চৈতন্য তার গানের বন্দিত নায়ক। আর গুরু লালন তার সর্বস্ব।

গানের বিরুদ্ধে ধর্মান্ধ মুসলমানদের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে তার তথ্য পূর্ণ পদ—

গান করিলে যদি অপরাধ হয়
কোরান মজিদ কেন ভিন্ন এলহানে গায়।।
রাগরাগিনী সুর রূহানী বলিয়া মসহুর
এত আলাপন আছে নিরূপন, তাতে হারাম কেন নয়।।
আর্বি পার্শি সকল ভাষায় গজল মর্সিয়া সিদ্ধ হয়

নবিজী যখন মদিনায় যায়, দফ বাজায়ে মদিনায় নেয়।।
বেহেস্তে সুর না—জায়েজ নয় দুনিয়ায় কেন হারাম হয়
দুদ্দু কয়, শুনি কোথায় গানের ফতোয়া পায়।।

২২.২ হাসন রাজা

দেওয়ান হাছন রজা চৌধুরী/ হাছন রাজা—সিলেটের রামপাশা লক্ষণশ্রীতে ১২৬১ এর ৭ পৌষ জন্মে ১৩২৯-এর ২৩ অগ্রহায়ণ মারা যান। তাদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন ধর্মান্তরিত হিন্দু। হাসনের পিতা ছিলেন আলি রেজা, জননী জাহানবেগম। তারা ছিলেন শ্রীহট্টের সুনামগঞ্জের সম্ভ্রান্ত জমিদার। এ পরিবারে ছিল গানের চর্চা। হাসনের সৎ বোন সহিফা বানু/ হাজিবিবি সিলেটের অন্যতম কবিও গীতিকার। উর্দু বাংলা দুভাষায় তিনি লিখতেন। তার রচিত গ্রন্থ হল 'সহিফা সঙ্গীত'। হাসনের দু ছেলে গনি ও একলিমুর কবি ও গীতিকার ছিলেন। একলিমুর রাজা রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ছিলেন।

বাংলাদেশে হাসন রাজাকে নিয়ে সিনেমা হয়েছে। অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। জন্মভূমিতে তার নামে গবেষণারগার ও সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছে। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, তাকে সপ্ত সাধকের মধ্যে স্থান দিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার প্রকাশ করেছে তার স্মরণে ডাকটিকিট ও ফার্স্ট-ডে কভার।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না হাসন রাজার। কিন্তু গান রচনায়ও সুরারোপে তিনি দক্ষ ছিলেন। দু'শতাধিক তার গান সংগৃহীত হয়েছে বহুগান হারিয়ে গেছে। সিলেটের 'আল ইসলাহ' পত্রিকায় হাসনের গানও জীবনী সংগৃহীত হয়েছিল। বেঁচে থাকতেই তিনি নিজের কাব্য সংগ্রহ 'হাছন উদাস' (১৯০৭) প্রকাশ করেন। মৃত্যুর পর পরিবারের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয় 'হাছন উদাস'-এর। দ্বিতীয় সংস্করণ। এবং 'হাছন বাহার' ও 'সৌখিন বাহার' বই দু'টি। সৌখিন বাহারের বিষয় ছিল নারী, ঘোড়া এবং কুড়া পাখির বাহ্যিক আকৃতি দেখে প্রকৃতি বিচার।

তার গানের ভাষায় শ্রীহট্টের আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব থাকলেও ভাবে এবং সুরে তা সর্বজনকে নন্দিত করে। গানে কখনও একাধিকবার ভনিতা ব্যবহার করেছেন তিনি। কথিত হয় যে তিনি চিস্তিয়া মতে দীক্ষিত ছিলেন। কিন্তু পদে মুর্শিদের নাম নেই তার। নিজেকে তিনি বাউল, আউল, পাগল, ফকির, কাঙ্গাল, বাঙ্গালী বলে চিহ্নিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাকে গ্রাম্য কবি বলেছেন। হাসনের সমসাময়িক শ্রীহট্টের পদকর্তা ছিলেন রাধারমন, শাহনুর, আবদুল ওহাব প্রমুখ। এখানে মহাপ্রভু চৈতন্যের, রাধাকৃষ্ণের এবং বেসরা সুফিদের সমন্বিত ঐতিহ্য বহমান ছিল। হাসন কোরাণ, বেসরা সুফি, কৃষ্ণকথার প্রসঙ্গকে নিগূঢ় অর্থে তার গানে ব্যবহার করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা প্রেমকে বলে 'পঞ্চম পুরুষার্থ'/ প্রয়োজন'। মালিকপন্থী সুফিরা প্রেমে স্রষ্টা স্বরূপ আস্বাদন করেন। এক নিজেকে আস্বাদন করার জন্য, দ্বিখণ্ডিত হয়ে অন্যজনকে খুঁজে ফিরে। প্রেমে মিলন ঘটে। এ প্রেমতত্ত্ব রূপ পেয়েছে হাসনের গানে। তার গানে অনিত্য জীবন, সাধনায় অক্ষমতা প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে। হাসনের গানে গুরুত্বপূর্ণ হল আমিতত্ত্ব/ আত্মতত্ত্ব। ভাণ্ডে আছে ব্রহ্মাণ্ড এবং স্রষ্টা। তাই নিজেকে চেনা, দেখা গুরুত্ব পূর্ণ। হাসন নিজের মধ্যে ভোগী হাসন রাজা, আর যোগী হাসনজান এ দুসত্তার উপস্থিতি দেখেছেন। অচিন স্রষ্টাকে ধরতে গিয়ে, 'দেখি ধরছি হাসন রাজারে'। বেসরা সুফিরা আদম/ নর দেহে আল্লাকে খুঁজতেন। এ সূতেরই মনসুর হাল্লাজ বলেছিলেন 'আনাল হক/ আমি সত্য'। এ মতাদর্শ প্রভাব ফেলেছে হাসনের গানে। সত্যকাম, সত্যাশ্রয়ী হাসন নিজের ভোগলিপ্সা নিয়ে রঙ্গ ব্যঙ্গ করেছেন। ক্ষণস্থায়ী জীবনের অতৃপ্তির কথা বলেছেন। জীবনে অমৃত পানের সুখের কথা বলেছেন। সিদ্ধান্ত করেছেন—

'আপনি চিনিলে খোদা চিনা যায়
হাসন রাজা আপন চিনিয়া এ গান গায়।।

ধর্মাচার, ইসলামি শরিয়তের সমালোচনা ও প্রত্যাখ্যান ছিল হাসনের জীবনে ও গানে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম অগ্রাহ্য করে তিনি লিখেছেন—

'হিন্দু বলয়ে তোমা রাধা, আমি বলি খোদা
রাধা বলিয়া ডাকিলে মুল্লামুন্সিয়ে দেয় বাঁধা।'

আচার ধর্মের অনুসারীদের তার গান না শুনতে বলেছেন তিনি—

'আমার গান শুনবে না, যার প্রেম নাই জানা।'

বর্ণময় জীবন কাটিয়েছেন হাসন রাজা। জমিদারী চালিয়েছেন যথা নিয়মে। তিনি বড় এক ভাওয়ালি নৌকায় নাচ, গান, বাজনা আর সঙ্গিনীদের নিয়ে কাল কাটাতেন। ডাঙ্গার বাড়িঘর, নানা ভোগ্যদ্রব্যে তার আসক্তি ছিল না। এগুলির অনিত্য সত্তা জেনেই তার বিখ্যাত গান—

'কি ঘর বানাইমু আমি শূন্যের মাঝার'

শ্রীহট্টের মুরারীচাঁদ কলেজ পত্রিকায়, প্রভাতকুমার শর্মার 'মরমী কবি হাসন রাজা' (১৯২৪) প্রবন্ধ দেখে, লেখকের কাছে হাসনের গান চেয়ে পাঠান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রভাতের পাঠানো পদ পেয়ে কবি, অবিলম্বে ১৯২৫-এ ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের সভায় অভিভাষণে হাসন রাজার পদের আলোচনা করেন। Philosophy of our people নামে নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় মর্ডান রিভিউতে (১৯২৬)। পরে প্রকাশিত হয় বঙ্গানুবাদ।

পূর্ববঙ্গের এক গ্রাম্য কবির গানে দর্শনের একটি বড় তত্ত্ব পাই, সেটি এই যে, ব্যক্তি স্বরূপের সমন্ধের সূত্রেই বিশ্বসত্য। তিনি গাহিলেন,

'মম আখি হইতে পয়দা আসমান জমিন
শরীর করিল পয়দা শক্ত আর নরম
আর পয়দা করিয়াছে ঠান্ডা আর গরম
নাকে পয়দা করিয়াছে খুসবয় বদবয়' (মূল রচনায় এর ভিন্ন পাঠ পাই)

এই সাধক কবি দেখিতেছেন যে শাশ্বত পুরুষ তাহারই ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাহার নয়ন পথে আবির্ভূত হইলেন। বৈদিক ঋষিও এমনিভাবে বলিয়াছেন, যে পুরুষ তাহার মধ্যে তিনিই আদিত্যমণ্ডলে অধিষ্ঠত।' পরে হিবার্ট লেকচারেও বাউল প্রসঙ্গ আসে।

রবীন্দ্রনাথের এ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় হাসন রাজা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিদগ্ধ জনেরা নানাভাবে তার মূল্যায়ন করেন।

- বিচার করিয়া দেখি সকলই আমি
  সোনামামী সোনামামী গো
  আমারে করিলা বদনামী।।
  আমি হৈতে আল্লা রসুল আমি হৈতে কুল
  পাগলা হাসন রাজা বলে তাতে নাই ভুল।।
  আমার হইতে আসমান জমিন আমি হইতেই সব
  আমি হৈতে ত্রিজগৎ আমি হৈতে রব।।
  আপন চিনিলে দেখ খুদা চিনা যায়

হাসন রাজা আপনি চিনিয়ে এই গান গায়।।

- বাউলা কে বানাইল রে
  হাসন রাজারে বাউলা কে বানাইল রে।।
  বানাইল বানাইল বাউলা তার নামটি হয় মৌলা।
  দেখিয়া তা রূপের চটক হাসন রাজা আউলা।।
  হাসন রাজা হইছে পাগল প্রাণ বন্ধুর কারণে।
  বন্ধু বিনে হাসন রাজায় অন্য নাহি জানে।।
  হাসন রাজা গাইছে গান হাতে তালি দিয়া
  সাক্ষাইতে দাঁড়াইয়া শোনে হাসন রাজার প্রিয়া।।

২২.৩ সংক্ষিপ্তসার

বাউল সাধক ও গান উনিশ শতকে বঙ্গের বিশিষ্ট জনদের আকর্ষণ করে। গুরুবাদী বাউলেরা মানুষের দেহ এবং জীবনযাপনকে প্রাধান্য দেয়। তারা আচার ধর্মকে লঙ্ঘন করে মানুষকে এক জাতি হিসাবে গণ্য করে। সম্প্রদায়-আর্য সামাজিক-লিঙ্গ ভেদকে তারা মানে না। মানে না সম্পদের উপর ব্যক্তির অধিকার। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বর্তমানে তারা বিশ্বাস করে। মানুষের উপাসনা করে তারা। তাদের সাধনা গোপন। কিন্তু গান প্রকাশ্য। এ সকল গানের সুর ও কথা মূল্যবান। লালন এ ঐতিহ্যের মহাকবি।

- সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
- পারে কে যাবি নবির নৌকাতে আয়
- সহজ মানুষ ভজে দেখনা রে মন দিব্যজ্ঞানে
- আমার এ ঘরখানা কে বিরাজ করে
- আমি একদিনো না দেখিলাম তারে প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত গান।

লালনের শিষ্য দুদ্দু বাউল তত্ত্বের ব্যাখ্যাতা ধারক ও বাহক। সমাজ চেতনায় তিনি উজ্জ্বল। মৌলবাদীরা তার গান ও জীবনকে মুছে দিতে চেয়েছে। কিন্তু সেগুলি কালোত্তীর্ণ হয়ে বেঁচে আছে।

সামন্ত ভূস্বামী হাসনরাজা এক বিশিষ্ট দর্শনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সব মিলিয়ে বাউল গান বঙ্গের এক বিশিষ্ট সাহিত্য-সঙ্গীত-সংস্কৃতি।

২২.৪ অনুশীলনী

বিস্তৃত বিশ্লেষণাত্মক উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন—

৮। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বাউল সংগীতের ভূমিকা নির্ণয় করুন।

৯। বাংলার শ্রেষ্ঠ বাউল আপনি কাকে মনে করেন? তাঁর জীবন সাধনা ও রচনার পরিচয় দিন।

১০। হাসন রাজার দর্শনের কোন দিকটি রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করেছিল, সে বিবরণ দিন।

১১। হিন্দু মুসলমান অনৈক্যকে দুদ্দু কেন পরাধীনতার সঙ্গে যুক্ত করেছেন, তা বিশ্লেষণ করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন—

৮। রবীন্দ্রনাথ লালনকে কীভাবে তুলে ধরেছিলেন তা আলোচনা করুন।

৯। লালনের মানবতাবাদ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

১০। ধর্মতত্ত্ব থাকলেও বাউলগানে মানুষকে বড়ো করে দেখা হয়েছে—আলোচনা করুন।

সহায়ক গ্রন্থ

১। বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *বাউল গান ও দুদ্দুশাহ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৩৭১

২। শক্তিনাথ ঝা, *দুদ্দু সা'র পদাবলি*, সহজপাঠ, কলকাতা, ২০১২

৩। শক্তিনাথ ঝা, *ফকির লালন সাঁই দেশকাল এবং শিল্প*, বর্ণপরিচয়, কলকাতা

৪। শক্তিনাথ ঝা, *ফকির লালন সাঁই-এর গান*, ১৪২১ কবিতা পাক্ষিক, কলকাতা, ২০০৫

৫। শক্তিনাথ ঝা (সম্পাদিত), *হাসন রাজা মরমী মৃত্তিকার ফসল*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯

৬। কাজল চক্রবর্তী, (সম্পা.) *প্রামাণ্য হাছন রাজা*, সাংস্কৃতিক খবর, কলকাতা, ২০১৭

৭। বসন্তকুমার পাল, *মহাত্মা লালন ফকির*, বঙ্গীয় পুরান পরিষদ, শান্তিপুর, ১৩৬২

৮। ওয়াকিল আহমদ, *লালন গীতি সমগ্র*, বইপত্র, ঢাকা, ২০০২

৯। সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড*

১০। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*

১১। আহাম্মদ শরীফ, *বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩

১২। ওয়াকিল আহমেদ, *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান*

১৩। অমরেন্দ্রনাথ রায়, *শাক্ত পদাবলী*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৫৯

নোটস্